ইসলামের
জীবন
পদ্ধতি

ইসলামের জীবন পদ্ধতি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ভূমিকা :

মানব চরিত মুলত এমন এক বিশ্বব্যাপী শাশ্বত সত্য যা দুনিয়ার সকল মানুষই অবগত আছে। পাপ ও পুন্য কিংবা ভাল ও মন্দ এমন কোন গোপনীয় বস্তু্ নয় যে, এটাকে অন্য কোন স্থান হতে খুজে বের করে আনতে হবে। এতে তো মানুষের জ্ঞাত ও চির পরিচিত সত্য। এর চেতনা ও অনুভুতি মানব প্রকৃতিতে খুবই স্বাভাবিক। কুরআনের ভাষায় ?? আল্লাহ তায়ালা মানব প্রকৃতিতে ভালো এবং মন্দের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই দান করেছেন। নেকীকে 'মারূফ' (জানা) এবং পাপকে 'মুনকার (অজানা) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এ ছাড়াও চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হলো কেন? কেনইবা বিভিন্ন চরিত্র নীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সৃষ্টি হলো? উল্লেখিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে ইসলামের জবাব এবং সেই অনুযায়ী রচিত বিশেষ ধরনের চরিত্র বিধান সম্পর্কেই এ পুস্তকখানিতে আলোচনা পেশ করেছেন বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে তার ?? নামক উর্দু গ্রন্থে, 'ইসলামের জীবন পদ্ধতি' তারই বাংলা অনুবাদ। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষায় বইখানির বেশ কয়েকটি সংস্করণই শেষ হয়েছে। পাঠকবর্গের আগ্রহ ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর পুন:প্রকাশ করা হলো।

ইসলামের নৈতিক আদর্শ

মানুষের প্রকৃতিতে চরিত্রের অনুভুতি একটা স্বাভাবিক অনুভুতি। ইহা এক প্রকারের গুণ ও কাজকে পসন্দ করে এবং আর এক প্রকারের গুণ ও কাজকে করে অপসন্দ। এ অনুভুতি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যেও কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবতার তীব্র চেতনা চরিত্রের কোন কোন গুণকে ভাল এবং কোন কোন গুণকে মন্দ বলে চিরদিন একইরূপে অভিহিত করেছে। সততা সুবিচার, ওয়াদাপূর্ণ করা এবং বিশ্বাসপরায়ণতাকে চিরদিন মানব চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করা হয়েছে। মিথ্যা, যুলুম, প্রতিশ্রুতি ভংগ করা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে মানবেতিহাসের কোন যুগেই পসন্দ করা হয়নি। সহানুভূতি, দয়া, দানশীলতা এবং উদারতাকে চিরদিনই সম্মান করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিকে কোন দিনই মর্যাদা দান করা হয়নি। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও আদর্শপরায়ণতা এবং বীরত্ব ও উচ্চ আশা চিরদিনই শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্ত গুণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। পক্ষান্তরে অস্থিরতা, নীচতা, খোশামোদী, হীন মনোবৃত্তি ও কাপুরুষতাকে কোন দিনই অভিনন্দিত করা হয়নি। আত্নসংযম, আত্নসম্মান জ্ঞান, নিয়ামানুবর্তিতা ও অকপট মেলামেশাকে চিরদিনই মানুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ করা হয়েছে এবং প্রবৃত্তির গোলামী, অশালীন আচরণ, সংকীর্ণতা, বে-আদবী ও কুটিল মনোবৃত্তি মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের তালিকায় কোন দিনই স্থান পায়নি। কর্তব্যপরায়ণতা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, কর্মপটুতা এবং দায়িত্ববোধ চিরদিনই সম্মান পেয়ে এসেছে। কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও কর্মবিমুখ মানুষকে কোনদিনই সুনজরে দেখা হয়নি। এভাবে সমাজ জীবনের ভাল ও মন্দ গুণাবলী সম্পর্কেও মানবতার সিদ্ধান্ত চিরকাল প্রায় একই প্রকারের রয়েছে।

পৃথিবীর দরবারে সম্মান এবং মর্যাদা চিরদিন কেবল সেই সমাজই লাভ করতে পেরেছে যাতে নিয়ম-শৃংখলা আছে, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা আছে, পারস্পরিক ভালোবাসা ও হিতাকাংখা আছে এবং সামাজিক সুবিচার ও সাম্য ব্যবস্থা আছে। দলাদলি উচ্ছৃংখলতা, ভেদ-বৈষম্য, অনিয়ম-অনৈক্য, পারস্পরিক শত্রুতা, যুলুম ও অসহযোগিতাকে দুনিয়ার ইতিহাসে কোন দিনই সামাজিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। কাজ-কর্মের ভাল-মন্দ সম্পর্কেও একথা সম্পূর্ণ রূপে সত্য। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, জালিয়াতি ও ঘুষখোরকী কোন দিনই ভাল কাজ বলে মনে করা হয়নি। কটুক্তি, নিপীড়ন, কুৎসা, চোগলখুরী, হিংসা-দ্বেষ, অকারণে দোষারোপ এবং মানব সমাজে অশান্তি ও উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করাকে কোন সময়েই পূণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়নি। প্রতারক, ধোকাবাজ, অহংকারী, রিয়াকারী (শুধু পরকে দেখাবার জন্য যে পুণ্যের কাজ করে) মুনাফিক ও অন্যায় জেদপরায়ণ এবং লোভী ব্যক্তি কখনও ভাল লোকের মধ্যে পরিগণিত হয়নি। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার খেদমত করা, আত্নীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা, বন্ধু-বান্ধের সাথে অকপট ও আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা, ইয়াতীম, মিসকীন ও অসহায় লোকদের দেখাশুনা করা, রুগ্ন ও অসুস্থ লোকদের সেবা শুশ্রুষা করা এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা চিরকালই নেকীর কাজ বলে অভিহিত হয়েছে। সৎকর্মশীল, মিষ্টভাষী, কোমল স্বভাব ও হিতাকাংখী মানুষ চিরদিনই সম্মান লাভ করেছে। মানবতা চিরদিনই সেসব লোককেই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে মনে কের এসেছে যারা সত্যবাদী, সত্যের অনুসন্ধানকারী, যাদের উপর সকল কাজেই নির্ভর করা চলে, যাদের ভিতর বাহির একই প্রকার এবং যাদের কথা ও কাজে পরিপূর্ণ মিল আছে, যারা শুধু নিজেদের প্রাপ্য অংশ লাভ করে তৃপ্ত হন এবং অন্যের অধিকারকে উদার চিত্তে আদায় করে থাকেন, যারা নিজেরা শান্তিতে থাকতে অভ্যস্ত এবং মানুষকেও শান্তি দান করতে যত্নবান, যাদের নিকট হতে প্রত্যেকেই মঙ্গলময় কাজের আশা করতে পারে এবং যাদের দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি-লোকসান হবার কারো আশংকা থাকে না।

এ আলোচনা হতে স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, মানব চরিত্র মূলত এমন এক বিশ্বব্যাপী সনাতন সত্য যা দুনিয়ার সকল মানুষই অবগত আছে। পাপ ও পূণ্য কিংবা ভাল ও মন্দ এমন কোন গোপনীয় বস্তু নয় যে, সেটাকে অন্য কোন স্থান হতে খুজে বের করে আনতে হবে। এটাতো মানুষের জ্ঞাত ও চির পরিচিত সত্য। এর চেতনা ও অনুভুতি মানব প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে নেকীকে ‘মারূফ’ (জানা) এবং পাপকে ‘মুনকার (অজানা) নামে অভিহিত করেছেন। নেকী তা-ই যাকে সকল মানুষ ভাল বলে জানে এবং পাপ তাই যাকে মানুষই ভাল বলে জানে না। এ তত্ত্ব সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে: ?? আল্লাহ তায়ালা মানব প্রকৃতিকে ভাল এবং মন্দের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই দান করেছেন। (সূরা আশ শামস : ৮)

চরিত্রের আদর্শ বিভিন্ন কেন?

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, চরিত্রের ভাল-মন্দ যখন সর্বজন জ্ঞাত ও পরিচিত এবং মানুষের এক প্রকারের গুণকে ভাল ও অন্য এক প্রকারের গুণকে মন্দ মনে করার ক্ষেত্রে সমগ্র দুনিয়া চিরদিন অভিন্ন মত পোষণ করেছে, এখন চরিত্র সম্পর্কে এরূপ বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হলো কেন? দুনিয়ার এ বিভিন্ন চরিত্র নীতির মধ্যে এরূপ পাথর্ক্য হবারইবা কারণ কি? চরিত্র সম্পর্কে ইসলামের আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা; একথা কোন্ কারণে বলা হয় এবং চরিত্রের ব্যাপারে ইসলামের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে দাবী করার মূলে এর বিশেষ অবদানই বা (Contribution) কি? এ বিষয়টি বুঝার জন্য যখন আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন চরিত্রনীতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা এ পার্থক্য দেখতে পাই যে, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন নৈতিক গুণকে প্রযুক্ত করা এবং তাদের সীমা ও তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করার ব্যাপারে দুনিয়ার চরিত্রনীতিগুলোর একটির সাথে অন্যটির মিল নেই।

আরো একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এ পার্থক্যের কারণ জানা যায় এবং তা এই যে, মূলত চরিত্রের ভাল-মন্দের মাপকাঠি নির্বাচন এবং ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের মাধ্যম নির্দিষ্ট করার ব্যাপারেই এদের একটির সাথে আর একটির সাদৃশ্য নেই। উপরন্তু আইনের পশ্চাতে কোন্ কার্যকরী শক্তি (Sanction) বর্তমান থাকবে যার চাপে এটা প্রবর্তিত হবে এবং কিসের প্রেরণাইবা মানুষ তা পালন করতে উদ্বুদ্ধ হবে ; এ মৌলিক প্রশ্নেও চরিত্রনীতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু এই পার্থক্য ও গরমিলের মূল কারণ যখন আমরা খুজে দেখতে চেষ্টা করি, তখন শেষ পর্যন্ত এ নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিশ্ব প্রকৃতি, বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরে মানুষের মর্যাদা এবং সেই দুনিয়ার মানুষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ধারণা থাকার দরুনই চরিত্রনীতিগুলো বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছে এবং ধারণার এ বিভিন্নতাই মূল হতে শুরু করে শাখা পর্যন্ত এদের মূল ভাবধারা, এদের মেযায ও প্রকৃতি এবং এদের রূপ কাঠামোকে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন করে দিয়েছে। মানুষের জীবন আসল সিদ্ধান্তমূলক প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এ বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে কিনা? থাকলে তা বহু না এক ? সৃষ্টিকর্তা যাকেই স্বীকার করা হবে তার গুণাবলী কি? আমাদের সাথে তার কিসের সম্পর্ক ? তিনি আমাদের পথপ্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ? আমরা তার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হবো কি ? জবাবদিহি করতে হলে কিসের জবাবদিহি করতে হবে ? আমাদের জীবনের পরিণতি কি ? কোন্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদেরকে কাজ করতে হবে ? বস্তুত এ সকল প্রশ্নের জবাব যে ধরনের হবে তদনুযায়ীই জীবন ব্যবস্থা রচিত হবে এবং এর সাথে সংগতি রেখে চরিত্রনীতি নির্ধারিত হবে।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দুনিয়ার বিভিন্ন জীবন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা, উল্লেখিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে এদেরকে কি জবাব দিয়েছে এবং সেই জবাব তার স্বরূপ ও পথ নির্ধারণের কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এখানে বিস্তারিত প্রকাশ করে বলা আমার পক্ষে কঠিন। কাজেই উল্লেখিত প্রশ্নগুলো সম্পর্কে ইসলামের জবাব এবং সেই অনুযায়ী রচিত বিশেষ ধরনের চরিত্র বিধান সম্পর্কেই আমি আলোচনা করব।

ইসলামের জবাব

ইসলামের জবাব এই যে, এ বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। তিনি নিখিল দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এর একচ্ছত্র মালিক, একমাত্র আইন রচয়িতা, পালনকর্তা ও প্রভু। তারই আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত্তিতে এ বিশ্ব প্রকৃতি সুশৃংখলার সাথে চলছে। তিনি সর্বজ্ঞ, বৃদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী। তিনি সকল শক্তির আধার। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছুই তার জ্ঞাত। তিনি দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অভাব-অভিযোগের কলংক হতে পবিত্র। নিখিল জাহানের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর উপর তার প্রভুত্ব ও আধিপত্য নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষ তার জন্মগত দাস - সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব ও আনুগত্যের পন্থা ও রীতিনীতি নির্ধারণ করা মানুষের কাজ নয়, এ সেই আল্লাহ তায়ালা তার পথ দেখাবার জন্য পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। জীবন যাপনের পরিপূর্ণ বিধান - সৎপথ লাভ করার পন্থা এহেন উৎস হতেই গ্রহণ করা মানুষের আবশ্য কর্তব্য। জীবনের সমগ্র কাজ-কারবারের জন্য আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে এবং এ জবাবদিহি তাকে এ দুনিয়ায় করতে হবে না - করতে হবে পরকালের জীবনে। দুনিয়ার বর্তমান জীবন মূলত একটা

পরীক্ষার সময় এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালার সামনে এ জবাবদিহির ব্যাপারে সফলতা লাভ করার উদ্দেশ্যেই মানুষের জীবনের সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে কেন্দ্রিভূত করা আবশ্যক। মানুষ তার সমগ্র সত্তাকে নিয়েই এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এটা তার সমগ্র শক্তি ও যোগত্যার পরীক্ষা। জীবনের সকল দিক ও বিভাগ ব্যাপিয়াই তার এ পরীক্ষা। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির বুকে মানুষের যেসব জিনিসের সম্মুখীন হতে হয় সে তার সাথে কি রকম ব্যবহার করল, তা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে দেখা আবশ্যক। এ যাচাই করার কাজ শুধু সেই শক্তিমান সত্তাই নিখুতরূপে করবেন যিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু, বাতাস ও পানি, প্রকৃতির আবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের মন ও মগয হাত ও পায়ের শুধু নড়াচড়া গতিবিধিরই নয়, তার চিন্তা ও আকাংখার পর্যন্ত রেকর্ড সুরক্ষিত করে রেখেছেন।

ইসলাম মানব জীবনের বুনিয়াদী জিজ্ঞাসাগুলোর এ জবাবই দিয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতিও মানব সম্পর্কে ইসলামের এ ধারণাই সেই আসল ও সর্বশেষ কল্যাণকে নির্দিষ্ট করে দেয় যা লাভ করা মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ। ইসলামের চরিত্র বিধানে কোন্ প্রকারের কার্যকলাপ ভাল নয় তা মাপকাঠি দ্বারাই পরিমাপ করে ঠিক করা যায়। উপরন্তু মানব জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হওয়ার পর মানুষের চরিত্র এমন একটা কেন্দ্রবিন্দু লাভ করতে পারে, যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র চারিদিক জীবন আবর্তিত হতে পারে এবং ঠিক তখনি মানব চরিত্র এর নিজস্ব কেন্দ্রবিন্দুতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও মযবুত হতে পারে। তখন তার অবস্থা কোন নোঙরহীন জাহাজের মত হতে পারে না-যা সামান্য দমকা হাওয়ায় কিংবা সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আঘাতে একদিক হতে অন্যদিকে চলে যায়। এভাবে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুনির্ধারিত হওয়ার ফলে মানুষের সামনে একটা কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য উপস্থিত হয় এবং সেই অনুসারেই মানব জীবনের চরিত্রগত সমস্ত গুণের উপযুক্ত সীমা, উপযুক্ত অবস্থান এবং উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়।

এভাবে আমরা এমন এক শ্বাশত ও চিরন্তন নৈতিক মূল্যায়ন (Values) লাভ করতে পারি, যা সমস্ত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজ কেন্দ্রবিন্দুতে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারিত হওয়ার ফলে মানব চরিত্র একটা সর্বোচ্চ লক্ষ্য লাভ করে, এর দরুন চারিত্রিক ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা সীমাহীন হতে পারে। অতপর জীবনের কোন ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা ও স্বার্থ পূজার পংকিলতা মানুষকে কলংকিত করতে পারে না।

চারিত্রিক ভাল-মন্দের মাপকাঠি

ইসলাম একদিকে যেমন আমাদের চরিত্রের ভাল-মন্দের মাপকাঠি দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি তার বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কীয় ধারণার সাহায্যে নৈতিক ভাল-মন্দ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভের একটি পূর্ণাংগ মাধ্যমও দান করেছে। এবং আমাদের ভাল-মন্দ আমাদের চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করার জন্য শুধু মানব বুদ্ধি কিংবা প্রবৃত্তি নিছক অভিজ্ঞতা অথবা মানুষের অর্জিত বিদ্যার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করতে বলেনি। কারণ তাহলে এ সবের পরিবর্তনশীল সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের নৈতিক বিধি-নিষেধগুলোও চিনদিনই পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং কোন একটি কেন্দ্রে স্থায়ী দাড়ানো এর পক্ষে কখনই সম্ভব হতো না। বস্তুত ইসলাম আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট উৎস দান করেছে, এটা হতে আমরা প্রত্যেক যুগেই এবং প্রত্যেক অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় নৈতিক বিধান লাভ করতে পারি - সেই উৎস হচ্ছে আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীস। এটা দ্বারা আমরা এমন একটা ব্যাপক বিধান লাভ করতে পারি যা মানুষের পারিবারিক জীবনের খুটিনাটি ব্যাপার হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিরাট বিরাট সমস্যা সহ জীবনের প্রত্যেকটা দিক ও প্রত্যেকটা শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারে। মানব জীবনের বিপুল কাজ-কর্মের ব্যাপারে ইসলামের এ নৈতিক বিধানকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে (Widest Application) দিলে কোনা অবস্থায়ই আমাদের অন্য কোন উৎসের মুখাপেক্ষী হবার প্রয়োজন হয় না।

তাছাড়া বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কে ইসলামের এ ধারণার এমন একটা উদ্বোধক ও প্রেরণাদায়ক শক্তিও বর্তমান রয়েছে, যা চরিত্র সম্পর্কীয় আইনের পশ্চাতে বিদ্যমান থাকা একান্ত আবশ্যক। সেই শক্তি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভয়, পরকালের জবাবদিহির আশংকা এবং চিরকালীন ধ্বংসের মধ্যে পড়ার ভয়াবহ আকঙ্ক। যদিও ইসলাম এমন একটা শক্তিশালী জনমতো গঠন করতে চায়, যা সমাজ জীবনে ব্যক্তি এবং দলগুলোকে চারিত্রিক নিয়ম-কানুন পালন করে চলতে বাধ্য করতে পারে এবং এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেও স্থাপন করতে চায়, যার ক্ষমতা দুনিয়ার চারিত্রিক আইনগুলোকে শক্তির বলে জারী করতে পারে। কিন্তু এ বাহ্যিক চাপের উপর ইসলামের প্রকৃত কোন নির্ভরতা নেই। এর পরিপূর্ণ নির্ভরতা হচ্ছে

মানুষের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত চাপের উপর। চরিত্রের বিধিনিষেধ জারী করার পূর্বে ইসলাম মানুষের মনে একথা বিশেষভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর সংগেই মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক। দুনিয়াবাসীর চোখ হতে মানুষ আত্মগোপন করতে পারে ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টি হতে সে কিছুতেই আত্মগোপন করতে পারে না। সারা দুনিয়াকে মানুষ ধোকা দিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে ধোকা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। দুনিয়া ত্যাগ করে মানুষ অন্যত্র চলে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কঠিন মুষ্ঠির বাইরে সে কিছুতেই যেতে পারে না। দুনিয়া দেখতে পারে শুধু বাইরের দিক ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানব মনের গোপন ইচ্ছা-বাসনা পর্যন্ত জানতে পারেন। দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনে তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার, কিন্তু একথা মনে রেখ যে, একদিন তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে। তখন সেখানে উকিল নিযুক্ত করা, ঘুষ দেয়া, যামিন সুপারিশ পেশ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ধোকা দেয়া ও প্রতারণা করা কিছুই চলবে না। সেখানে তোমার ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।

এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়ে ইসলাম যেন প্রত্যেকটি মানুষের মনে একটা পুলিশ বাহিনীর কড়া পাহারা নিযুক্ত করে দিয়েছে। চরিত্রের বিধি-নিষেধ পালন করার জন্য এটা মনের অভ্যন্তর হতে মানুষকে নিরন্তর বাধ্য করতে থাকে। এ আইন পালন করতে বাধ্য করার জন্য বাইরের কোন পুলিশ, কোন আদালত এবং কারাগার বর্তমান থাকুক আর না-ই থাকুক তাতে কিছুই আসে যায় না। ইসলামের নৈতিক আইনের পশ্চাতে এটাই হচ্ছে আসল শক্তি যা এটাকে বাস্তব ক্ষেত্রে নিরন্তর জারী করে থাকে। তারপর জনমত এবং রাষ্ট্রশক্তি এর সাহায্যে ও সহযোগিতা করলে তা সোনায় সোহাগা, নতুবা শুধু এ 'ঈমান'ই মুসলমান ব্যক্তি ও জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য সেই ঈমান এতদূর প্রবল হওয়া আবশ্যক, যেন তা মানব হৃদয়ের গভীর মর্মমূলকে পরিব্যপ্ত করে নিতে পারে।

সৎকাজের প্রেরণা

বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সম্পর্কে ইসলামের এ ধারণা মানব হৃদয়ে এমন এক দুর্নিবার আবেগ সৃষ্টি করে যা চারিত্রিক আইন-কানুন পালন করার জন্য মানুষকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করতে থাকে। মানুষ যখন নিজ ইচ্ছাতেই আল্লাহকে আল্লাহ বলে এবং তার দাসত্ব করাকে জীবনের একমাত্র পথ বলে স্বীকার করে আর আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভ করাকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে তখনই সে নিজে অন্তরের আবেদনই আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধগুলো পালন করবে। এই সঙ্গে পরকাল বিশ্বাসও একটা উদ্বোধক শক্তি, কারণ সে নিসন্দেহে বিশ্বাস করে যে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার হুকুম-আহকাম অনুসরণ করবে, দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনে তাকে যতই দু:খ-কষ্ট ভোগ করেত এবং অভাব-অভিযোগ ও নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হোক না কেন। পরকালে তার চিরস্থায়ী জীবনে এক উজ্জল ভবিষ্যত লাভ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হবে, দুনিয়ায় এ সংক্ষিপ্ত জীবনে সে যতই আনন্দ স্ফূর্তি ও আয়েশ-আরাম করুক না কেন পরকালে তাকে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত এ আশা, এ ভয় এবং বিশ্বাস কোনা মানুষের মনে যদি বদ্ধমূল হতে পারে, তবে তার অন্তর্নিহিত এ বিরাট উদ্বোধক শক্তি তাকে এমন সব স্থানে পুণ্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে যেখানে পুণ্যের পার্থিব ফল মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে এবং এমন সময়ও তাকে পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখতে পারে, যখন এ পাপের কাজ খুবই লাভজনক ও লোভনীয় হয়ে দাড়াবে।

ইসলামের চারিত্রিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য

উপরের বিস্তারিত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইসলামের বিশ্ব প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা, এর ভাল-মন্দের মাপকাঠি, এর চরিত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের উৎস এবং এর উদ্বোধক ও প্রেরণা শক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন জিনিস। এদেরই সাহায্যে ইসলাম এর সুপরিচিত চরিত্রনীতির উপাদানগুলোকে নিজের মূল্যায়ন অনুসারে সজ্জিত করে মানব জীবনের সমগ্র বিভাগে পর্যায়ক্রমে জারী করে। এরই উপর ভিত্তি করে অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, ইসলামের চরিত্র বিধান পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সতন্ত্র জিনিস। এ বিধানের বৈশিষ্ট্য যদিও অসংখ্য কিন্তু এর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেগুলোকে এ বিধানের অভিনব অবদান বলা যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ

এর প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা আল্লাহ তায়ালার সন্তোষ লাভকে মানব জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে চরিত্রের জন্য এমন একটা উন্নত মাপকাঠি ঠিক করেছে যার দরুণ মানব চরিত্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চরিত্র সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভ করার জন্য একটি মাত্র উৎসকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে ইসলামী চরিত্র এতখানি স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করেছে যে, তাতে উন্নতির সম্ভাবনা তো পুরোপুরিই বর্তমান, কিন্তু বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে বহুরূপী সাজার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালার ভয় মানব হৃদয়ের এমন একটি বিরাট শক্তি, যা বাইরের কোন চাপ ছাড়া মানুষকে চরিত্রের নিয়ম-কানুন পালন করতে ভিতর হতেই উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস এমন এক শক্তি দান করে, যার দরুন মানুষ নিজেই মনের আগ্রহেই চরিত্রের বিধি-নিষেধ পালন করতে প্রস্তুত হয়।

ভাল-মন্দের পরিচয়

এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা শুধু অবাস্তব কল্পনার সাহায্যে কতগুলো আশ্চর্য ধরনের চরিত্রনীতি ঠিক করেনি এবং মানুষের সর্ববাদী সমর্থিত চরিত্রনীতির এক অংশের মূল্য কম এবং অপর অংশের মূল্য বেশী দেখাবার চেষ্টাও এটা করেনি। ইসলাম এমন সব জিনিসকে চরিত্রের অন্তর্ভূক্ত করেছে, যা দুনিয়ার সকল মানুষের দ্বারাই সমর্থিত এবং কিছুটা অংশ নিয়েই যথেষ্ট মনে করা হয়নি বরং এর সবটুকুকেই সে নিজের নীতি বলে গ্রহণ করেছে। তারপর একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার সাথে মানুষের জীবনে তার একটা স্থান, একটা মর্যাদা এবং একটা সুস্পষ্ট ব্যবহার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেছে। ইসলাম এর ব্যাপক চরিত্রনীতিকে মানব জীবনে এমন সামঞ্জস্যের সাথে প্রযুক্ত করেছে যে, ব্যক্তিগত কাজ-কারবার, পারিবারিক সম্পর্ক, নাগরিক জীবন, আভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, বাজার-বন্দর-শিক্ষাগার, আদালাত ফৌজদারী, পুলিশ লাইন, সেনানিবাস, যুদ্ধের ময়দান, স্বস্তি পরিষদ - মোটকথা মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের উপর ইসলামের ব্যাপক চরিত্রনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব বর্তমান। মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগের উপর ইসলাম স্বীয় চরিত্রনীতিকেই একমাত্র ‘শাসক’ নিযৃক্ত করেছে এবং জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের চাবিকাঠি প্রবৃত্তি, স্বার্থবাদ এবং সুবিধাবাদের পরিবর্তে, চরিত্রের হাতে ন্যস্ত করাই ইসলামের ঐকান্তিক চেষ্টা।

মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম মানবতার কাছে এমন এক জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করার দাবী উপস্থিত করেছে, যা স্থাপিত হবে সর্ববাদী সমর্থীত চরিত্রনীতির উপর এবং সেই চরিত্রনীতির বিরোধী কোনা জিনিসের বিন্দুমাত্র প্রভাবও তাতে থাকবে না। তার দাওয়াত হচ্ছে এই যে, যেসব মংগলময় কাজকে মানব প্রকৃতি চিরদিনই ভাল বলে মনে করেছে-এসো, আমরা তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করি। আর যেসব পাপ ও অন্যায় কাজকে মানুষ চিরকালই খারাপ মনে করেছে, অন্যায় বলে ঘৃণা করেছে-এসো আমরা সেসসবকে পরাজিত করি, দুনিয়ার বুক হতে চিরতরে বিলিন করে দেই। ইসলামের এ আহবানে সাড়া দিয়েছে, তাদেরকে একত্রিত করে ইসলাম এক নবজাতির প্রতিষ্ঠা করেছে, এ জাতির নামই মুসলিম। এ নবজাতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তারা সমস্ত ভাল ও কাজকে দুনিয়ায় জারি ও কায়েম করবে এবং সমস্ত পাপ ও অন্যায় কাজকে পৃথিবীর বুক হতে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে সাধনা করবে-সংগ্রাম করবে। কিন্তু আজ যদি সেই জাতিরই হাতে সত্য ও পুণ্য পরাজিত হয় এবং পাপের নগ্ন অনুষ্ঠান নিত্য নতুন উপায়ে উৎকর্ষ লাভ করে, তবে তা বড়ই দু:খের কথা সন্দেহ নাই। সেই দু:খ সমগ্র মুসলিম জাতির এবং সেই দু:খ দুনিয়ার নিখিল মানুষের।

ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা

সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি

"দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই বংশোদ্ভূত"-এ মতের উপরই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম একজোড়া মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সেই জোড়া হতে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্ম হয়েছে। প্রথম দিক দিয়ে একজোড়া মানুষের সন্তানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল ; তাদের ভাষাও ছিল এক। কোন প্রকার বিরোধ-বৈষম্য তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই তারা পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এ বিস্তৃতির ফলে তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বংশ, জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেল, পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে অনেক বৈষম্য ও বৈচিত্র দেখা দিল। দৈনন্দিন জীবন যাপনের রীতিনীতিও আলাদা হয়ে গেল এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাদের রং, রূপ ও আকার-আকৃতি পর্যন্ত বদলিয়ে গেল। এসব পার্থক্য একেবারেই স্বাভাবিক, বাস্তব দুনিয়ায়ই এটা বর্তমান। কাজেই ইসলামও এসবকে ঠিক একটা বাস্তব ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ইসলাম এসবকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবারা পক্ষপাতি নয়, বরং এসবের দ্বারা মানব সমাজে পারস্পরিক পরিচয় লাভ করা যায় বলে ইসলাম এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বাদেশীকতরা যে হিংসা-দ্বেষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, ইসলাম তা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না, এর দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে শুধু জন্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ, আশারফ-আতরফ এবং আপন পরের যে পার্থক্য করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা একেবারেই জাহেলিয়াত একেবারেই মূর্খতাব্যঞ্জক। ইসলাম সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, তোমরা সকলেই এক মাতা ও এক পিতার সন্তান, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই এবং মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে তোমরা সকলেই সমান।

পার্থক্য ও তার কারণ

মানুষ সম্পর্কে এ ধারণা গ্রহণ করার পর ইসলাম বলে যে, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য যদি হতে পারে, তবে তা বংশ, বর্ণ, ভৌগলিক সীমা এবং ভাষার ভিত্তিতে নয়, তা হতে পারে মনোভাব, চরিত্র ও জীবনার্দশের দিক দিয়ে। এক মায়ের দুই সন্তান বংশের দিক দিয়ে যতই এক হোক না কেন, তাদের মনোভাব, চিন্তাধারা এবং চরিত্র যদি বিভিন্ন রকমের হয়, জীবনের কর্মক্ষেত্রে তাদের পথও সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই দূর সীমান্তের অধিবাসী প্রকাশ্যে যতই দূরবর্তী হোক না কেন, তাদের মত ও চিন্তাধারা যদি এক রকমের হয়, তাদের চরিত্র যদি এক প্রকারের হয়, তবে তাদের জীবনের পথও সম্পূর্ণ এক হবে, সন্দেহ নেই। এ মতের ভিত্তিতে ইসলাম দুনিয়ার সমগ্র বংশ এবং আঞ্চলিক ও জাতীয়তার বুনিয়াদে গঠিত সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত এক অভিনব সমাজ গঠন করে, যার চিন্তাধারা, মত, চরিত্র ও আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। এ সমাজে মানুষ ও মানুষের মিলনের ভিত্তি শুধু জন্মগত নয় বরং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা বিশ্বাস এবং জীবনের একটা আদর্শ। যে ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালাকে নিজের মালিক ও প্রভু বলে স্বীকার করবে এবং নবীর প্রচারিত বিধানকে নিজ জীবনের একমাত্র আইন বলে গ্রহণ করেব, সেই ব্যক্তিই এহেন সমাজের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে, হোক সে আফ্রিকার অধিবাসী কিংবা আমেরিকার, আর্য হোক কিংবা অনার্য, কালো হোক কিংবা গোরা হিন্দি ভাষাভাষি হোক কিংবা আরবী ভাষাভাষি। আর যেসব মানুষ এ সমাজে প্রবেশ করবে তাদের সকলের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদাও সম্পূর্ণ সমান হবে। তাদের মধ্যে বংশীয়, জাতীয় অথবা শ্রেনীগত বৈষম্যের কোন স্থানই থাকবে না। সেখানে কেউ উচ্চ আর কেউ নীচু নয়, কোন প্রকারের ছুৎমার্গ তাদের মধ্যে থাকবে না। কারো হাতের স্পর্শে কারো অপবিত্র হয়ে যাবারা আশংকা থাকবে না। বিবাহ-শাদী, খানা-পিনা, বৈঠকী মেলামেশার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বাধা-বিপত্তি থাকবে না। কেউ নিজ জন্ম কিংবা পেশার দিক দিয়ে নীচ কিংবা ছোট জাত বলে পরিগণিত হবে না। কেউ নিজ জাত কিংবা পরিবারের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারবে না। যার চরিত্র অধিকতর ভাল এবং অন্যান্য লোক অপেক্ষা যার মনে আল্লাহর ভয় অনেক বেশী মানব সমাজে একমাত্র তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

এ সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা বংশ ও ভাষার সমস্ত বৈষম্য এবং ভৌগলিক সীমারেখা চূর্ণ করে পৃথিবীর কোণে কোণে বিস্তৃত হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে দুনিয়ার নিখিল মানুষের এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে। বংশীয় এবং আঞ্চলিকতার বুনিয়াদে স্থাপিত সমাজগুলোতে শুধু সেই লোকেরাই শামিল হতে পারে, যারা নির্দিষ্ট একটি বংশে কিংবা নির্দিষ্ট কোন এক দেশে জন্মলাভ করে, তার বাইরের লোকদের পক্ষে এ ধরেনের সমাজের দুয়ার চিরতরে বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের এ চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে এ মত ও চরিত্রনীতির সমর্থক প্রত্যেকটি মানুষই প্রবেশ লাভ করতে পারে। আরা যারা সেই বিশ্বাস ও চরিত্রনীতিকে সমর্থন করে না, ইসলামী সমাজ তাদের নিজের মধ্যে শামিল করে নিতে পারে না বটে কিন্তু তাদের সাথে মানবোচিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদেরকে মানবোচিত অধিকার দান করতে এটা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এক মায়ের দুই সন্তান যদি মত ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তবে অবশ্য তাদের জীবন যাপন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে, তারা একে অপরের ভাই-ই নয়। এভাবে সমগ্র মানব বংশের দু'টি দল কিংবা এক দেশের অধিবাসী লোকদের দু'টি দলও যদি ধর্মমত এবং চরিত্রনীতির দিক দিয়ে তারা অবশ্যই সম্পূর্ণ এক-অভিন্ন। সম্মিলিত মানবতার ভিত্তিতে সে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অধিকার দেয়ায় ধারণা করা যেতে পারে ইসলামী সমাজ তা সবই অমুসলিম সমাজকে দিতে প্রস্তুত।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার এ মৌলিক কথাগুলো বুঝে নেয়ার পর আমরা মানবীয় মিলন-প্রীতির বিভিন্ন ব্যাপারের জন্য ইসলাম নির্ধারিত যাবতীয় নিয়ম ও রীতিনীতির আলোচনা করব।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ

মানব সমাজের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। একজন পুরুষ ও একজন নারী। পারস্পরিক মিলনের ফলেই হয় এ পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এ মিলনের ফল স্বরূপ এক নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। তারপর সেসব সন্তানের দিক দিয়ে নতুন আত্নীয়তা, সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। আর সব শেষে এ জিনিসই ছড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে একটি বিরাট সমাজের আকারে আত্নপ্রকাশ করে। বস্তুত পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে একটি বংশ এর অধস্তন পুরুষকে মানব সভ্যতার বিপুল দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষ স্নেহ, ত্যাগ, হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও দরদ এবং হিতাকাংখা সহকারে তৈরী করতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার স্থায়িত্ব এবং ক্রমোন্নতির জন্য নতুন লোকের কেবল জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরং এর কর্মচারীগণ যে মনে প্রাণে এটাই কামনা করে যে, তাদের স্থান দখল করার জন্য যে নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে তারা তাদের চেয়েও উপযুক্ত হোক। এ দিক দিয়ে এ তত্ত্ব কথায় কোন সংশয় থাকে না যে, পরিবারই হচ্ছে মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি। আর এ মূল ভিত্তির সুস্থতা ও শক্তির উপর স্বয়ং তামাদ্দুনের সুস্থতা ও শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে। এ জন্যেই ইসলাম সর্বপ্রথম এ পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শুদ্ধ ও মযবুত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করেছে।

দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নারী ও পুরুষের মিলন তখনই বিশুদ্ধ ও সংগত হতে পারে যখন এ মিলনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি থাকবে এবং তার ফলে একটি নতুন পরিবার সৃষ্টি হতে পারবে। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও দায়িত্বহীন মিলনকে ইসলাম শুধু একটি নিষ্পাপ স্ফূর্তী কিংবা একটি সাধারণ পদস্খলন মনে করেই উপেক্ষা করতে পারে না। এর দৃষ্টিতে এটা সভ্যতার মূল বুনিয়াদকেই একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ ধরনের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ হারাম ও আইনগত অপরাধ বলে মনে করে। এ ধরনের অপরাধের জন্য ইসলাম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যেন মানব সমাজে এরূপ সভ্যতা ধ্বংসকারী সম্পর্ক স্থাপনের সমস্ত কারণ ও সুযোগের ছিদ্র পথ হতে রক্ষা করতে চায়। পর্দার হুকুম, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশায় নিষেধ, নাচগান ও ছবির উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ, সংগত ও নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঠিক সেই উদ্দেশ্যই করা হয়। আর এ বাধা-নিষেধের কেন্দ্রীয় ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করে তোলা। অন্যদিকে নারা-পুরুষের দায়িত্বপূর্ণ মিলন অর্থাৎ বিবাহকে ইসলাম শুধু সংগত বলেই ঘোষণা করেনি বরং তাকে মংগলময়, পুণ্যের কাজ এবং একটি ইবাদাত বলে মনে

করে। বয়:প্রাপ্তির পর নারী-পুরুষের অবিবাহিত থাকা ইসলাম একেবারেই সমর্থন করে না। সমাজের প্রত্যেক যুবককে সে এ জন্য উৎসাহিত করে যে, তার মাতাপিতা তামাদ্দুনের যে দায়িত্বপূর্ণ করেছেন, তাদের পালা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও সেই দায়িত্ব পালন করেত প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইসলামে সন্ন্যাসবাদ আদৌ সমর্থীত নয়। উপরন্তু এটাকে মনে করে আল্লাহর নির্ধারিত স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটি বেদায়াত। যেসব 'বদ রসম' ও কুসংস্কারের দরুন বিবাহ একটা কঠিন দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে, ইসলাম সে সবের তীব্র প্রতিবাদ করে। এর একান্ত ইচ্ছা এই যে, মানব সমাজে বিবাহ যেন অতীব সহজসাধ্য এবং ব্যভিচার যেন খুবই কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর এর বিপরীত বিবাহ কঠিন এবং ব্যভিচার খুবই সহজসাধ্য যেন কখনও হতে পারে না। এ জন্যই ইসলাম কয়েকটি বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হারাম করে দেয়ার পর অন্যান্য সমস্ত দূর ও নিকটাত্নীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েজ করে দিয়েছে। আশরাফ-আতরাফদের সমস্ত ভেদাভেদ চিরতরে চূর্ণ করে দিয়ে সমস্ত মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-শাদীর অবাধ অনুমতি দিয়েছে। 'মোহর' ও দান যৌতুক খুবই সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনক করার হুকুম দিয়েছে, যেন উভয় পক্ষই তা খুব সহজেই বহন করতে সমর্থ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপন করার জন্য কোন কাযী, পন্ডিত, পুরোহিত কিংবা অফিস ও রেজিষ্টারের কোনই আবশ্যকতা নেই। ইসলামী সমাজে বিবাহ খুবই সহজ, সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। যে কোন স্থান দু'জন সাক্ষীর সামনে বয:প্রাপ্ত নারী-পুরুষের ইজাব-কবুলের দ্বারা অনায়াসেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এ ইজাব-কবুল গোপনে হলে চলবে না এটা মহল্লা বা গ্রামের লোকজনকে জানিয়ে-শুনিয়ে করতে হবে।

পারিবারিক জীবনের পদ্ধতি

পারিবারিক জীবনে ইসলাম পুরুষকে পরিবারের কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছে। ঘরের শৃংখলা রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর এবং সন্তানকে পিতামাতা উভয়েরই আনুগত্য করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যে পরিবারে কোন শৃংখলা ব্যবস্থা নেই এবং ঘরের লোকদের চরিত্র ও কাজ-কারবার সুস্থ রাখার জন্য দায়িত্বশীল কেউ নেই, ইসলাম এ ধরনের শিথিল পারিবারিক ব্যবস্থা মোটেই পসন্দ করে না। শৃংখলা রক্ষা করার জন্য একজন শৃংখলাকারীর একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম এ দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিবারের পিতাকেই স্বাভাবিক কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তার অর্থ কখনই এটা নয় যে, পুরুষকে ঘরের একজন সেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্বাধীন-শাসনকর্তা করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম ভালবাসাই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের মূল ভাবধারা। একদিকে স্বামী আনুগত্য করা যেমন কর্তব্য অন্যদিকে স্বামীরও কর্তব্য এই যে, সে তার ক্ষমতা অন্যায়, যুলুম ও বেইনসাফীর কাজে প্রয়োগ না করে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ করে তুলার জন্য ব্যবহার করবে। দাম্পত্য সম্পর্ককে ইসলাম ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বাচিয়ে রাখতে চায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে প্রেম-ভালবাসার মাধুর্য কিংবা অন্তত নিরবিচ্ছিন মিলন-প্রীতির সম্ভাবনা বর্তমান থাকবে। কিন্তু এ সম্ভাবনা যখন একেবারেই থাকবে না, তখন স্বামীকে তালাক দেয়ার এবং স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিবার অধিকার দেয়, আর যেসব অবস্থায় বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মিলন প্রেমের পরিবর্তে শুধু অশান্তিরই কারণ হয়ে পড়ে, সেখানে ইসলামী আদালতকে বিবাহ ভেঙ্গে দেবার আদেশ দিয়ে থাকে।

আত্নীয়তার সীমা

পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে আত্নীয়তাই হচ্ছে নিকটবর্তী সীমান্ত। এর পরিধি বহু প্রশস্ত হয়ে থাকে। যারা মা-বাপের সম্পর্ক কিংবা ভাই-ভগ্নির সম্পর্ক, অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একে অন্যের আত্নীয় হবে ইসলাম তাদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, সাহায্যকারী ও দয়াশীল দেখতে চায়। কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় নিকটাত্নীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করার আদেশ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে আত্নীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও এর 'হক' আদায় করার জন্য বার বার তাকীদ এসেছে এবং এটাকে একটা বড় পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করেছে। যে ব্যক্তি নিজ আত্নীয়দের সাথে মনোমালিন্য, কপটতা ও তিক্ততাপূর্ণ ব্যবহার করবে, ইসলাম তাকে মোটেই ভাল চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আত্নী-স্বজনদের অনাহুত পক্ষপাতিত্ব করাও ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সৎকাজ নয়, নিজ পরিবার ও গোত্রের লোকদের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা ইসলামের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এরূপ কোন সরকারী অফিসার যদি জনগণের অর্থ দ্বারা নিজ লোকদের প্রতিপালন করতে শুরু করে, কিংবা কোন বিষয়ের বিচারের বেলায় তাদের প্রতি অকারণে পক্ষপাতিত্ব করে তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা একটি শয়তানী অপরাধ। ইসলাম যে আত্নীয়তা রক্ষা করার আদেশ দেয়, তা নিজের দিক দিয়ে এবং হক ও ইনসাফের সীমার মধ্যে হওয়া চাই।

প্রতিবেশীর অধিকার

আত্নীয়তার সম্পর্কের পর দ্বিতীয় নিকটবর্তী হচ্ছে প্রতিবেশীর সম্পর্ক। কুরআনের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথমত, আত্নীয় প্রতিবেশী, দ্বিতীয়, অনাত্নীয় প্রতিবেশী এবং তৃতীয়, অস্থায়ী প্রতিবেশী - অল্পকালের জন্য যার সাথে উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ হয়েছে, ইসলামের সমাজ-বিধান অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই বন্ধুত্ব সহানুভূতি এবং ভাল ব্যবহার পাবার অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) বলেছেন, প্রতিবেশীর অধিকারী রক্ষা করার জন্য আমাকে এতদূর তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার দেয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা হচ্ছিল। একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : প্রতিবেশীর সাথে যে ব্যক্তি ভাল ব্যবহার করবে না, সে প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার নয়। অন্য একটি হাদীসে নবী মুস্তফা (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করেব এবং তারই পাশে তার প্রতিবেশী উপবাস থাকবে, মনে করতে হবে সে ব্যক্তির ঈমান নেই। একবার হযরত (সা)-এর নিকট নিবেদন করা হয়েছিল যে, একটি মেয়েলোক খুব বেশী নফল সালাত আদায় করে, প্রায়ই সাওম রেখে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে দান-খয়রাত করে থাকে ; কিন্তু তার কটুক্তিতে তার প্রতিবেশী ভয়ানক নাজেহাল। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। উপস্থিত লোকেরা নিবেদন করল, অন্য একটি মেয়েলোক এমন আছে, যার মধ্যে এ ধরনের ভাল গুণ অবশ্য নেই ; কিন্তু প্রতিবেশীকে সে কষ্ট দেয় না। হযরত (সা) বললেন : সে বেহেশতী হবে।

নবী মুস্তফা (সা) লোকদের বিশেষ তাকীদ করে বলেছেন যে, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য কোন ফল কিনে আনলে তার কিছু অংশ তোমার প্রতিবেশীর ঘরে অবশ্যই পাঠিও, নতুবা ফলের খোসা বাইরে নিক্ষেপ করো না, কারণ এটা দেখে গরবী প্রতিবেশীর মনে দু:খ জাগতে পারে। নবী মুস্তফা (সা) বলেছেন : তোমার প্রতিবেশী যদি তোমাকে ভাল বলে, তবে তুমি নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু তোমার সম্পর্কে তোমার প্রতিবেশীর মত যদি খারাপ হয়, তবে তুমি একজন খারাপ লোক তাতে কোনই সন্দেহ নেই। মোটকথা, যারা একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করেছে, ইসলাম সেসব লোককে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, সাহায্যকারী ও সুখ-দু:খের সাথী হিসেবে দেখতে চায়। ইসলাম তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় যে, তারা যে একজন অপরজনের উপর নির্ভর করতে পারে এবং একজন অপরজনের সাহায্যে নিজের জান-মাল ও সম্মানকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যেসব সমাজে একটা দেয়ালের দু'দিকে অবস্থিত দু'ঘরের অধিবাসী দু'জন মানুষ পরস্পর চিরদিন অপরিচিত থাকে এবং যে সমাজে এক গ্রামের অধিবাসীর মধ্যে পারস্পরিক কোন সহানুভূতি, কোন সহৃদয়তা ও নির্ভরতা নেই সেসব সমাজ কখনো ইসলামী সমাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

সমাজ জীবনের প্রধান নিয়মাবলী

এসব নিকটবর্তী আত্নীয়তা ও সম্বন্ধের বাইরে সম্পর্কের যে এক বিশাল ক্ষেত্র সামনে এসে পড়ে গোটা মুসলিম সমাজই তার অন্তর্ভূক্ত। এ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ইসলাম আমাদের সামগ্রিক জীবনকে যেসব বড় বড় নিয়ম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, সংক্ষেপে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

এক : নেক ও পরহেযগারীর কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর, পাপ ও অন্যায় অনুষ্ঠানে কোন প্রকার সাহায্য করো না। (কুরআন)

দুই : তোমাদের বন্ধুতা ও শত্রুতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দান করবে এ জন্য যে, দান করা আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, আর কাউকে কিছু দেয়া বন্ধ করলে তা এ জন্য করবে যে, তাকে কিছু দেয়া আল্লাহ পসন্দ করেন না (হাদীস)

তিন: তোমরা এক অতীব উৎকৃষ্ট জাতি, মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুণ্যের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করাই তোমাদের জীবনের একমাত্র কাজ। (কুরআন)

চার : পরস্পর পরস্পপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না একজন অপরজনের কাজ-কারবারের খুত বের করতে চেষ্টা করো না। পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ হতে আত্নরক্ষা করো। কারো শত্রুতা করো না। আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত বান্দাহ এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো। (হাদীস)

পাচ : জেনে-শুনে কোন যালেমের সাহায্য করো না। (হাদীস)

ছয় : অন্যায় কাজে নিজ জাতির সাহায্য করার উদাহরণ এই যে, তোমার উট কূপে পড়ে যাচ্ছিল, আর তার লেজ ধরে তুমিও তার সঙ্গে সঙ্গে কূপে পড়ে গেলে। (হাদীস)

সাত : তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর, অপরের জন্যও ঠিক তাই পসন্দ করো। (হাদীস)

ইসলামের রাজনীতি

ইসলামের রাজনীতির বুনিয়াদ তিনটি মূলনীতির উপর স্থাপিত : তাওহীদ, নবুয়াত এবং খিলাফত। এ তিনটি মূলনীতিকে বিস্তৃতভাবে বুঝতে না পারলে ইসলামী রাজনীতির বিস্তারিত বিধান হৃদয়ংগম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কাজেই সর্বপ্রথম আমি এ তিনটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব।

তাওহীদ

তাওহীদের অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার মানুষ সহ সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং একমাত্র মালিক। প্রভুত্ব, শাসন এবং আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার একমাত্র তারই। কোন কিছু করার আদেশ দেয়া এবং কোন কাজের নিষেধ করার ক্ষমতা শুধু তারই কাছে বর্তমান। আল্লাহ তায়ালার সাথে মানুষ কাউকে শরীক করবে না। আমরা যে সত্তার দরুন বেচে আছি, আমাদের যে শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বল-শক্তি দ্বারা আমরা কাজ করি, দুনিয়ার সকল জিনিসেরই উপর আমাদের এই যে অধিকার ও ব্যবহার ক্ষমতা প্রয়োগ করি - তার কোনটাই আমাদের উপার্জিত নয়। এর সৃষ্টি ও অবদানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কেউ শরীক নেই। আমাদের নিজেদের এ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং আমাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির সীমা নির্ধারণ করা আমাদের করণীয় কাজ নয়, আর না এতে অন্য কারোও একবিন্দু অধিকার আছে।

এ সবকিছু শুধু সেই আল্লাহর করণীয় যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের এত শক্তি ও স্বাধীনতা দান করেছেন এবং দুনিয়ার অসংখ্য জিনিসকে আমাদের ভোগ-ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। তাদের এ ধারণা মানবীয় প্রভুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। একজন ব্যক্তি মানুষই হোক কিংবা একটি পরিবার বা একটি শ্রেণী হোক কিংবা মানুষের একটি বড় দল, একটি জাতি কিংবা সামগ্রিকভাবে সারা দুনিয়ার মানুষ হোক, সার্বভৌ্ম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, তার আদেশই হচ্ছে মানুষের জন্য একমাত্র আইন।

নবুয়াত

আল্লাহ তায়ালার এ আইন যে উপায়ে মানুষের নিকট এসে পৌছেছে, তার নাম নবুয়াত। এ নবুয়াতের ভিতর দিয়ে আমরা দু'টি জিনিস লাভ করে থাকি। এক : কিতাব - যাতে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের আইন-কানুনের বিবরণ দিয়েছেন। দুই : সেই কিতাবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা - যা রাসূল (সা) আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজের কথা ও কাজের ভিতর দিয়ে সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন। যে মূলনীতির উপর মানুষের ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত আল্লাহ তায়ালা সবই তার কিতাবে এক এক করে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল (সা) আল্লাহর কিতাবের সেই উদ্দেশ্য অনুসারে কার্যকরীভাবে জীবন যাপনের একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। আর তার আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা বলে দিয়ে আমাদের জন্য একটি উজ্জল আদর্শ রূপে উপস্থিত করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় এ দু'টি জিনিসের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে শরীয়াত। ইসলামী রাষ্ট্র এ বুনিয়াদী নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খিলাফত

এখন খিলাফতের কথা আলোচনা করা যাক। আরবী ভাষায় এ শব্দ প্রয়োগ করা হয় প্রতিনিধিত্বের অর্থ বুঝার জন্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার দেয়া স্বাধীনতা অনুযায়ী কাজ করবে। আপনি যখন কারো উপর আপনার জায়গা-জমির ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করেন, তখন চারটি কথা আপনার মনে অবশ্যই বর্তমান থাকে। প্রথম এই যে, জমির প্রকৃত মালি সে নয়, - আপনি নিজে। দ্বিতীয়, আপনার জমিতে সে কাজ করবে আপনারই দেয়া আদেশ-উপদেশ অনুসারে। তৃতীয়, আপনি তাকে কাজকর্ম করার যে সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকেই তাকে কাজ করতে হবে - আপনার দেয়া স্বাধীনতাকে সেই সীমার মধ্যেই তার ব্যবহার করতে হবে। আর চতুর্থ এই যে, আপনার জমিতে তাকে - তার নিজের নয়-আপনার উদ্দশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। এ চারটি শর্ত প্রতিনিধিত্বের ধারণার মধ্যে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে, 'প্রতিনিধি' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা আপনিই মানুষের মনে এটা জেগে উঠে। আপনার কোন প্রতিনিধি যদি এ চারটি শর্ত পূর্ণ না করে তবে আপনি অবশ্যই বলবেন যে, সে প্রতিনিধিত্বের সীমালংঘন করেছে এবং সে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, যা 'প্রতিনিধির' শব্দের অর্থেই নিহিত রয়েছে। ইসলাম মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার 'প্রতিনিধি' বলে নির্দিষ্ট করেছে। এই খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের ধারণার মধ্যেই উক্ত চারটি শর্ত অনিবার্য রূপে বিদ্যমান। ইসলামী রাজনীতির এ মহান আদর্শ অনুসারে যে রাষ্ট্র কায়েম হবে, মূলত তা হবে আল্লাহ তায়ালার নিরংকুশ প্রভুত্বের অধীনে মানুষের খিলাফত। আল্লাহর এ রাজ্যে তারই দেয়া আদেশ-উপদেশ অনুসারে তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে কাজ করে তার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষের একমাত্র কাজ।

খিলাফতের এ ব্যাখ্যা প্রসংগে আর একটি কথা বুঝে নেয়া দরকার। তা এই যে, ইসলামের এ রাজনৈতিক মত কোন ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা কোন পরিবার বা কোন শ্রেণী বিশেষকে 'প্রতিনিধি' বলে আখ্যা দেয়নি, বরং মানুষের সেই গোটা সমাজকেই এ খিলাফতের পদে অভিষিক্ত করেছে, যারা তাওহীদ ও রেসালাতের মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে খিলাফতের উল্লেখিত শর্তাবলী পূর্ণ করতে প্রস্তুত হবে, এমন সমাজই সমষ্টিগতভাবে খিলাফতের অধিকারী - এ খিলাফত এহেন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য।

গণতন্ত্র

ইসলামের রাজনীতিতে এখান থেকেই শুরু হয় গণতন্ত্রের পদক্ষেপ। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই খিলাফতের অধিকারী ও আযাদীর মালিক। এ অধিকার ও স্বাধীনতার সমগ্র মানুষই সমান অংশের অংশীদার। এ ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোন মানুষ অন্য কোন ব্যক্তিকে তার এ অধিকার ও স্বাধীনতার স্বত্ব হতে বঞ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসন শৃংখলা বিধানের জন্য যে সরকার গঠিত হবে তা এ সমাজেরই ব্যক্তিদের মত অনুযায়ী গঠন করতে হবে। এরাই নিজ নিজ খিলাফতের অধিকার হতে এক অংশ সেই সরকারকে দান করবে। রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাদের মতের মূল্য অনিবার্যরূপে স্বীকৃত হবে। তাদেরই পরামর্শক্রমে গভর্ণমেন্ট চলবে। তাদের আস্থা যে ব্যক্তি লাভ করতে পারবে।

আর যে তাদের আস্থা হারাবে, সে অবশ্যই খিলাফতের পদ হতে বিচ্যুত হেত বাধ্য হবে। এ দিক দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্র একটি পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। একটি গণতন্ত্র যতদূর পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও নিখুত হতে পারে, এটা ঠিক ততখানিই পরিপূর্ণ ও নিখুত। কিন্তু ইসলামের এ গণতন্ত্র পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে মূলতই সম্পূর্ণ আলাদা। এদের মধ্যে আকার-পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্য এ দিক দিয়ে যে, পাশ্চাত্য রাজনীতি 'জনগণের প্রভুত্বকে' বুনিয়াদরূপে স্বীকার করে, কিন্তু ইসলাম স্বীকার করে জনগণের 'খিলাফত'কে। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণই হচ্ছে বাদশাহ, আর ইসলামের দৃষ্টিতে বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর, জনগণ তার প্রতিনিধি মাত্র। পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণ নিজেরাই দেশের শাসনতন্ত্র ও আইন রচনা করে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সেই শরীয়াত বা আইনের অনুসরণ করে চলতে হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

পাশ্চাত্য রাজনীতিতে গভর্ণমেন্টের কর্তব্য হচ্ছে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছাকে পূর্ণ করা আর ইসলামী গভর্ণমেন্ট এবং তার প্রতিষ্ঠাতা জনগণ সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে সার্থক করা। মোটকথা, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হচ্ছে আযাদ, নিরংকুশ ও বল্গাহারা প্রভৃত্ত - যার নিজ অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ভোগ করে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত - ইসলামী গণতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইনের অনুসরণ করা। এখানে মানুষ তার অধিকার ও স্বাধীনতাকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে তারই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করা।

অতপর আমি তাওহীদ, রেসালাত ও খিলাফতের ভিত্তিতে স্থাপিত ইসলামী রাষ্ট্রের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট চিত্র অংকন করব।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআন শরীফে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, তা সেসব মংগল ও কল্যাণময় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে, বিকাশ দান করবে এবং উৎকর্ষ সাধন করবে, যে সবের অমংগল ও পাপ অনুষ্ঠানকে বাতিল করবে, পরাজিত করবে এবং নি:শেষে বিলীন করবে। মানুষের জীবনে যে সবের স্পর্শ মাত্রকেও আল্লাহ তায়ালা পসন্দ করেন না ইসলামের রাজ্যের শৃংখলা সম্মলিত ইচ্ছা-বাসনা চরিতার্থ করাও এর লক্ষ্য নয়। ইসলাম রাষ্ট্রের সম্মুখে এমন এক উচ্চতম ও উন্নততর লক্ষ্য উপস্থিত করে, যা অর্জন করা একান্তভাবে কর্তব্য। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যে কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎকর্ষ দেখতে চান তাকে বিকশিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত করতে হবে। আর ধ্বংস ও উচ্ছৃংখলতার এবং এমন সমস্ত উপায়ের উৎসমুখ চিরতরে বন্ধ করতে হবে যা আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে তার এ রাজ্যকে ধ্বংস করতে পারে, তার সৃষ্টি মানব জাতির জীবন নষ্ট করতে পারে। এ লক্ষ্য উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম আমাদের সামনে ভাল-মন্দ উভয়ের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পেশ করেছে। তাতে বাঞ্ছিত কল্যাণ ও মংগলকে এবং অকল্যাণগুলোকে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এ চিত্র সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেক যুগে এবং সকল প্রকার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই তার নিজ সংশোধনী প্রোগ্রাম রচনা করতে পারে।

শাসনতন্ত্র

মানব জীবনে প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখাতেই চারিত্রিক রীতিনীতিগুলোকে পরিপূর্ণরূপে পালন করা ইসলামের চিরন্তন দাবী। এ কারণে এটা নিজ রাষ্ট্রের জন্য এ সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এর রাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষ, সুবিচার, সততা এবং খাটি ঈমানদারীর উপর স্থাপিত হবে। এটা স্বাদেশিক, প্রশাসনিক বা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার খাতিরে মিথ্যা, প্রতারণা এবং অবিচারের প্রশ্রয় দিতে কোন অবস্থাতেই প্রস্তুত নয়। দেশের অভ্যন্তরে শাসক ও শাসিতদের মধ্যস্থিত সম্পর্কই হোক, আর দেশের বাইরে অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্কই হোক উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম সততা, বিশ্বাসপরায়নতা এবং সুবিচারের জন্য সমস্ত প্রকারের স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত। মুসলিম ব্যক্তিদের মত মুসলিম রাষ্ট্রকেও এটা এ জন্য বাধ্য করে যে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করতে হবে, লেন-দেন ঠিক রাখতে হবে এবং যা বলবে তা করতে হবে, নিজের প্রাপ্য আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্যকে স্মরণ করতে হবে, যা করবে তা বলবে এবং অন্যের দ্বারা তার কর্তব্য আদায় করার প্রাপ্য (হক) ভুলে যেতে পারবে না।

শক্তিকে যুলুমের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে তাকে সুবিচার কায়েম করার উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরের ন্যায্য অধিকারকে সবসময়ই হক বলে মনে করতে এবং তা আদায় করতে হবে। শক্তিকে মনে করতে হবে আল্লাহ তায়ালার আমানত এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাকে প্রয়োগ করতে হবে যে, এ আমানতের পুরাপুরি হিসেব তাকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে অবশ্যই দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীর বিশেষ একটা অঞ্চলে স্থাপিত হয়ে থাকলেও মানবীয় অধিকারগুলোকে সে কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধা করে না - নাগরিকত্বের অধিকারেও নয়। শুধুমাত্র মানবতার দিক দিয়েই ইসলাম মানুষের জন্যে কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্বীকার করে এবং সকল সময়ই সেগুলোকে পূর্ণরূপে রক্ষা করার আদেশ দেয়। সেই মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে বাস করুক কিংবা এর বাইরে বাস করুক, সে মিত্রই হোক কিংবা শত্রু তার সাথে সন্ধি থাকুক কিংবা যু্দ্ধই চলতে থাকুক। মানুষের রক্ত সকল সময়ই সম্মান পাবার যোগ্য, বিনা কারণে কিছুতেই মানুষের রক্তপাত করা যেতে পারে না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন এবং আহত লোকদের উপর কোনক্রমেই আক্রমণ করা যেতে পারে না। নারীর সতীত্ব চিরদিনই সম্মানিত ও সুরক্ষণীয়, কোন কারণেই তা নষ্ট করা যেতে পারে না।

ক্ষুধার্তের জন্য অন্নের, বস্ত্রহীনদের জন্য বস্ত্রের এবং আহত কিংবা রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রুষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে-সে ব্যক্তি শত্রূপক্ষেরই হোক না কেন। এ কয়টি এবং এধরেনর আরো কয়েকটি অধিকার ইসলাম মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই দান করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের মূল শাসনতন্ত্রে এ সকলকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা হয়েছে। তারপর নাগরিক অধিকারকে ইসলাম কেবল মাত্র সেসব লোকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়নি, যারা রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে বরং প্রত্যেক মুসলমান-দুনিয়ায় যে কোন অংশেই তার জন্ম হোক না কে-ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে প্রবেশ করা মাত্রই এর নাগরিক হয়ে যায় এবং সেই দেশের জন্মগত নাগরিকদের সমতুল্য অধিকার তাকে দান করা হয়। দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র যত সংখ্যকই হোক না কেন এদের সব কয়টির মধ্যে নাগরিক অধিকার হবে সর্বসম্মিলিত। কোন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হবে মুসলিম ব্যক্তির 'পাসপোর্ট'-অনুমতি পত্রের আবশ্যক হবে না। কোন বংশীয়, জাতীয় কিংবা শ্রেণীতে বৈষ্যম ছাড়াই প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রের বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে পারবে।

যিম্মিদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যেসব অমুসলিম বাস করে, তাদের জন্য ইসলাম কতগুলো অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছ। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে তা অবশ্য বিধিবদ্ধ থাকবে (যিম্মীর শাব্দিক অর্থ যার যিম্মা বা দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়)। ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের জান-মাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেই তারা যিম্মী নামে অভিহিত হয়। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ অমুসলিমদেরকে বলা হয় যিম্মী। যিম্মীর জান-মাল ও মান-সম্মান সবই একজন মুসলিম নাগরিকের জান-মাল ও মান-সম্মানের মতই মর্যাদা পাবে। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আইনের বেলায় মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। যিম্মীদের 'পার্সনাল-ল' অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতায় ইসলামী রাষ্ট্র কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। যিম্মীদের মন, ধর্মমত ও ধর্মীয়

আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা, উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। যিম্মী তার ধর্ম প্রচারই শুধু নয়, আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে ইসলামের সমালোচনাও করতে পারবে।

ইসলামী শাসনতন্ত্রে অমুসলিম প্রজাদেরকে এগুলো এবং এ ধরনের আরো অনেকগুলো অধিকার দান করা হয়েছে। এ অধিকারগুলো চিরস্থায়ী। ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে তারা যতদিন থাকবে ততদিন তাদের এ অধিকার কিছুতেই হরণ করা যেতে পারে না। অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্র এর অধীনে মুসলিম প্রজাদের উপর যতই যুলুম করুক না কেন, তার প্রতিশোধ হিসেবে একটা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে এর অধীন অমুসলিম প্রজাদের উপর শরীয়াতের খেলাফ বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। এমনকি আমাদের সীমান্তের বাইরে সমস্ত মুসলমানকে যদি হত্যাও করে ফেলা হয়, তবুও আমরা আমাদের সীমার মধ্যে একজন যিম্মীর অকারণে রক্তপাত করতে পারি না।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব একজন আমীর বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর অর্পণ করা হয়। এ আমীরকে 'সদরে জমহুরিয়া' বা রাষ্ট্র পরিষদের সভাপতির সমান মনে করা যেতে পারে। আমী নির্বাচনের ব্যাপারে এমন সমস্ত বয়:প্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষের ভোট দেবার অধিকার থাকে যারা শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলোকে স্বীকার করে। আমীর (রাষ্ট্র প্রধান) নির্বাচনের মূলনীতি এই যে, ইসলামের মূল ভাবধারার অভিজ্ঞতা, ইসলামী স্বভাব-প্রকৃতি আল্লাহর ভয় এবং রাজনৈতিক প্রতিভার দিক দিয়ে যে ব্যক্তি সমাজের অধিকাংশ লোকের আস্থাভাজন হবে। এমন ব্যক্তিকেই আমীর নির্বাচন করতে হবে তারপর সেই আমীরের সাহায্যের জন্য একটি 'মজলিশে শুরা' বা পার্লামেন্ট গঠন করতে হবে। 'মজলিশে শুরার' পরামর্শ নিয়ে রাজ্যের সমস্ত শৃংখলা রক্ষা করা আমীরের কর্তব্য হবে। আমীরের প্রতি যতদিন পর্যন্ত জনগণের আস্থা থাকবে ততদিনই সে আমীর থাকতে পারবে। আস্থা হারিয়ে ফেললে তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। আর যতদিন তার প্রতি লোকদের আস্থা থাকবে, গভর্ণমেন্টের অধিকার ও কর্তৃত্ব তার হাতে থাকবে। আমীর এবং তার সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে আইন রচনা করা হবে শরীয়াতের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে। আল্লাহ তায়ালা এবং তার রাসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ শুধু অনুসরণ ও প্রতিপালনের জন্যই। কোন আইন পরিষদ তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল করতে পারে না কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ এবং রাসূলের যেসব হুকুমের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা হবে, তাতে শরীয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা শুধু সেসব লোকের কাজ, যারা শরীয়াতের পরিপূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন। কাজেই এ ধরনের কাজ 'মজলিশে শুরা' হতে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত সাব-কমিটির নিকট সোপর্দ করতে হবে। তারপর মানুষের দৈনন্দিন কাজ কারবারের এমন অনেক ক্ষেত্রও থাকে, যে সম্পর্কে শরীয়াত নির্দিষ্ট কোন হুকুম দেয়নি। কাজেই এ ব্যাপারে 'মজলিশে শুরা' দ্বীন ইসলামের নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আইন রচনা করতে পারে।

আদালত

ইসলামী আদালত শাসন কর্তৃপক্ষের অধীন নয় ; বরং তা সরাসরিভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধির মর্যদায় অভিষিক্ত এবং একে আল্লাহ তায়ালরই সামনে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আদালতের বিচারকদের যদিও শাসন কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করে ; কিন্তু এক ব্যক্তি যখন আদালতে বিচারকের পদে বসবে, তখন সে আল্লাহ তায়ালার আইন অনুসারে জনগণের মধ্যে নিরপেক্ষ ইনসাফ করবে। তার ইনসাফের হাত হতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও বাচতে পারে না। বিচারকের সামনে এমনভাবে দাড়াতে হবে-যেমন করে দাড়াতে হয় রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিককে।

ইসলামের অর্থনীতি

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সত্য ও সুবিচারের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম কয়েকটি নিয়ম এবং সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে-যেন সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই যাবতীয় সম্পদ উৎপাদন এবং তা ব্যয়-ব্যবহার ও আবর্তন হতে পারে। সম্পদ উৎপাদনের এবং একে সমাজের মধ্যে আবর্তিত করার কার্যকরী পন্থা কি হবে, সে সম্পর্কে ইসলাম কোনই আলোচনা করে না। কারণ তা সভ্যতার উন্নতি ও ক্রমবিকাশ এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে গড়ে, আবার বদলে যায়। উৎপাদন-উপায় নির্ধারণ মানুষের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে আপনা-আপনিই হয়ে থাকে। তবে ইসলামের ঐকান্তিক দাবী এই যে, সর্বকালে এবং সকল অবস্থাতেই-মানুষের অর্থনৈতিক কাজ-কর্ম যে আকারই ধারণ করুক না কেন-ইসলামের নিয়মগুলোকে মযবুত বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এর নির্দিষ্ট সীমা অবশ্যই রক্ষা করে কাজ করতে হবে।

জীবিকা অর্জনের অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবী এবং অন্তর্গত সমস্ত জিনিসই আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য পৃথিবীর ভূমি হতে নিজের জীবিকা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করাও প্রত্যেকটি মানুষেরই জন্মগত অধিকার। দুনিয়ার সমস্ত মানুষই এ অধিকারের ব্যাপারে সমান। কাউকে এ অধিকার হতে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। আর এ ব্যাপারে এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেনীর উপর কোন প্রাধান্য বা অগ্রাধিকারও দেয়া যেতে পারে না। শরীয়াত অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা বংশ কিংবা কোন শ্রেণীকে জীবিকা অর্জনের বিশেষ কোন উপায় গ্রহণের অধিকার হতে বঞ্চিত করা, কিংবা কোন কোন পেশার দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ করে দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। এরূপে শরীয়াতের দৃষ্টিতে এমন কোন বৈষম্যও সৃষ্টি করা যেতে পারে না যার দরুন জীবিকা অর্জনে কোন বিশেষ উপায় বা পন্থার উপর বিশেষ কোন শ্রেণীর বা বংশের কিংবা গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হতে পারে। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে তারই নির্দিষ্ট জীবিকা অর্জনের উপায়গুলো দ্বারা নিজের ন্যায্য অংশ আদায়ের চেষ্টা করার অধিকার সকল মানুষেরই সমানভাবে বর্তমান এবং এ চেষ্টার দ্বারা নির্বিবাদে সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক।

মালিকহীন সম্পদ

প্রকৃতির যেসব সম্পদ সৃষ্টি করা কিংবা ব্যবহার উপযোগী করার ব্যাপারে কোন মানুষের শ্রম বা যোগ্যতা ব্যয় করতে হয়নি, তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ভোগ করার সাধারণ অনুমতি রয়েছে। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা হতে উপকৃত হওয়ার প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। নদী ও পুকুরের পানি, জংগলের কাঠ, প্রাকৃতিক গাছ-পালার ফল, প্রাকৃতিক ঘাস ও পরগাছা, বায়ু, পানি, বন্য পশু, ভূগর্ভস্থ খনি প্রভৃতি সম্পদে কারো একচ্ছত্র ইজারাদারী স্থাপিত হতে পারে না এবং তার উপর এমন কোন বিধি-নিষেধও আরোপ করা যেতে পারে না, যার দরুন দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তা হতে বিনামূল্যে উপকৃত হবার পথে বাধা জন্মিতে পারে। তবে যারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির ধনভান্ডার হতে অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করতে চাবে, তাদের কর ধার্য করা যেতে পারে।

ব্যবহার করার নিয়ম

আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকারের জন্য যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তা বিনা কাজে ফেলে রাখা কিছুতেই সংগত নয়। 'হয় নিজে তা ব্যবহার কর, নতুবা অন্য লোককে তা হতে উপকৃত হবার সুযোগ দাও'-ঠিক এ নিয়মের ভিত্তিতে ইসলামী আইন এ ফয়সালা করেছে যে, মানুষ নিজের জমি তিন বছরের অধিককাল অনাবাদী অবস্থায় ফেলে রাখতে পারে না। সে যদি তার জমি চাষাবাদ না করে, কিংবা তার উপর কোন দালান-কোঠা নির্মাণ না করে তবে এমন কি কোন কাজেই যদি তা ব্যবহার না করে তবে তিন বছর কাল অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে মনে করা হবে। অন্য কোন মানুষ যদি একে কোন কাজে ব্যবহার করে, তবে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করা যাবে না এবং সেই জমি অন্য একজনকে ব্যবহার করার জন্য দেয়ার অধিকার ইসলামী হুকুমাতের অবশ্যই থাকবে।

মালিকানার ভিত্তি

প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হতে যদি কেউ নিজেই কোন জিনিস গ্রহণ করে এবং নিজের শ্রম ও যোগ্যতার দ্বারা তা ব্যবহার উপযোগী করে নেয়, তবে সেই ব্যক্তিই হবে সেই জিনিসের মালিক। যেমন কোন পতিত জমি-যার উপর এখনো কারো মালিকানা স্বত্ব স্থাপিত হয়নি-যদি কোন ব্যক্তি এতে নিজের অধিকার স্থাপন করে এবং কোন কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে তাকে কিছুতেই বে-দখল করা যেতে পারে না। ইসলামের অর্থনীতি অনুসারে দুনিয়ায় সমস্ত মালিকানা স্বত্বের সূত্রপাত এমনি করেই হয়েছে। প্রথমে যখন পৃথিবীতে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল, তখন এখানকার সমস্ত কিছুই সব মানুষের সমান অধিকারের বস্তু ছিল। পরে যে ব্যক্তি যে জিনিসকে দখল করে কোন প্রকারে কার্যোপযোগী করে তুলেছে সে-ই এর মালিক হয়ে বসেছে ; অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের কাজেই তা ব্যবহার করার সংগত অধিকার লাভ করেছে, অন্য কোন লোক যদি সেই জিনিস ব্যবহার করতে চায়, তবে তার নিকট হতে সে ভাড়া নিতে পারবে। এটা মানুষের সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের স্বাভাবিক বুনিয়াদ এ বুনিয়াদকে নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখাই কর্তব্য।

মালিকানার সংরক্ষণ

শরীয়াত সংগত উপায়ে দুনিয়ার কোন মানুষ যদি কিছুর মালিকানা অধিকার লাভ করে থাকে তবে অবশ্যই তা রক্ষা করতে হবে। কারো এ মালিকানা স্বত্ব শরীয়াতের দৃষ্টিতে সংগত কিনা কেবল এ দিক দিয়েই এর চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। বস্তুত শরীয়াতের দৃষ্টিতে যে সকল স্বত্ব অসংগত প্রমাণিত হবে, তাকে অবশ্য খতম করতে হবে। কিন্তু যেসব মালিকানা শরীয়াত অনুযায়ী জায়েজ হবে, তাকে নষ্ট করার কিংবা তার মালিকদের সংগত অধিকারে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের বা কোন আইন পরিষদের নেই। সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের শ্লোগান দিয়ে এমন কোন অর্থব্যবস্থা কিছুতেই কায়েম করা যেতে পারে না, যা শরীয়াত প্রদত্ত সংগত অধিকার নষ্ট করবে। সমাজের স্বাভাবিক স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের মালিকানার উপর স্বয়ং শরীয়াত যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে, তা হ্রাস করা যত বড় যুলুম, তাতে বৃদ্ধি করাও ঠিক ততখানিই যুলুম সন্দেহ নেই। বস্তুত স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের শরীয়াত সংগত মালিকানার হেফাযত এবং তাদের নিকট শরীয়াতের নির্ধারিত 'সামাজিক স্বার্থকে' আদায় করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার

আল্লাহ তায়ালা তার নিজের নিয়ামত বন্টন করার ব্যাপারে সমতা রক্ষা করেননি। উপরন্তু এক শ্রেণীর লোকদের উপর এ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। দৈহিক সৌন্দর্য, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, স্বাস্থ্য শারীরিক শক্তি-সামর্থ, মস্তিষ্কের বুদ্ধি-প্রতিভা, জন্মগত পারিপার্শ্বিকতা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসও দুনিয়ার সকল মানুষ সমানভাবে পায়নি। জীবিকার ব্যাপারেও ঠিক এরূপ স্বাভাবিক পার্থক্য বিদ্যমান আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম ধন-সম্পদের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়। অতএব মানুষের মধ্যে একটা কৃত্রিম আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যতই তদবীর করা হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য ও নীতির দিক দিয়ে তা সবই ভুল। ইসলাম যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হচ্ছে ধন-সম্পদ উপার্জনের জন্য সংগ্রাম করার সুযোগ-সুবিধার সাম্য। ইসলামের দাবী এই যে, সমাজের আইন ও প্রচলিত প্রথায় এমন কোন প্রতিবন্ধকতা কিছুতেই থাকতে দেয়া হবে না, যার দরুন মানুষ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে অর্থোপার্জনের জন্য সংগ্রাম করতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এবং এমনসব বিরোধ বৈষম্যকেও উৎপাটিত করতে হবে, যাতে কোন শ্রেণী বংশ এবং পরিবারের জন্মগত সৌভাগ্যকে আইনের জোরে চিরস্থায়ী করে রাখা হয়? এ দু'টি পন্থায় স্বাভাবিক অসাম্যের স্থানে জবরদস্তি একটা কৃত্রিম সমতা স্থাপন করে। এ জন্যই ইসলাম সমাজের অর্থব্যবস্থাকে এমন এক স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে চায়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি শক্তি পরীক্ষা করার অবাধ সুযোগ লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা এবং তার পরিমাপের ব্যাপারে সমস্ত মানুষকে জোর করে সমান করে দিতে চায়, ইসলাম তাদের সাথে একমত নয়। কারণ তারা স্বাভাবিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিণত করতেই সচেষ্ট। যে অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেকটা মানুষই অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে ঠিক সেই-স্থান হতেই যাত্রা শুরু করতে পার যে স্থানে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাই হতে পারে একমাত্র স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থা। মোটর নিয়ে যার জন্ম হয়েছে, সে মোটর নিয়ে যাত্রা করবে। যে শুধু দু'পা নিয়ে এসেছে, সে পদাতিক হয়েই চলবে এবং পংগু অবস্থায় যার জন্ম হয়েছে, সে অবস্থায়ই সে চলতে শুরু করবে। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মোটরের উপর মোটর ওয়ালার স্থায়ী ইজারা স্থাপিত করে এবং পংগু ব্যক্তির পক্ষে মোটর অর্জন করা অসম্ভব করে দেয়,

মানব সমাজে তা সমর্থনীয় নয়। পক্ষান্তরে যে আইন এ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে জবরদস্তী করে একই স্থান হতে এবং একই অবস্থা হতে যাত্রা শুরু করতে বাধ্য করে, আর একজনের সাথে অপরজনকে চিরদিনের জন্য অবশ্যম্ভাবী রূপে বেধে রাখে তাও স্বাভাবিক ও কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা নয়। এর ঠিক বিপরীত, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা তাই হতে পারে, যাতে উপার্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করার সকল মানুষেরই অবাধ সুযোগ থাকবে। যে পংগু অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে সে যেন নিজ শ্রম ও যোগ্যতার বলে মোটর লাভ করতে পারে এবং যে প্রথমে মোটর নিয়ে চলেছিল, পরবর্তীকালে সে যদি নিজের অযোগ্যতার দরুন পংগু হয়ে বসে তবে সে যেন পংগুই হয়ে থাকে।

সংঘর্ষের বদলে সহযোগিতা

ইসলাম সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে শুধু অবাধ ও নিরংকুশ করতে চায় না ; বরং এ ক্ষেত্রের প্রতিযোগীদেরকে পরস্পরকে প্রতি নির্দয় ও কঠোর হওয়ার পরিবর্তে সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী করে তুলতেও বদ্ধপরিকর। এ জন্য একদিকে এর নৈতিক শিক্ষা দীক্ষা দ্বারা মানুষের মনে তাদের অক্ষম ও জীবন সংগ্রামে পরাজিত ভাইদের জন্য নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দেয়ার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টিত, অপর দিকে সে সমাজে এমন একটা মযবুত সংগঠন বর্তমান রাখার দাবী করে, যার উপর অসমর্থ ও উপায়হীন লোকদের সকল অভাব-অভিযোগ দূর করার দায়িত্ব অর্পিত থাকবে। অর্থোপার্জনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা যাদের নেই, তারা সেই প্রতিষ্ঠান হতে নিজ নিজ জীবিকা গ্রহণ করবে। যারা কালের দুর্ঘটনার আঘাতে বিপন্ন হয়ে এ প্রতিযোগিতায় ক্লান্ত হয়ে পড়বে এ প্রতিষ্ঠান তাদেরকে উঠিয়ে পুনরায় যোগ্য করে দেবে। আর এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য যাদের সাহায্যের দরকার হবে তারা এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য অনায়াসেই লাভ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম আইনত এ সিদ্ধান্ত করেছে যে, দেশের সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ হতেও শতকরা আড়াই টাকা বাৎসরিক এবং এরূপ সমস্ত পণ্যদ্রব্য হতেও শতকরা আড়াই টাকা বাৎসরিক যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। ওশর (ফসলের এক-দশমাংশ) ফরয হতে পারে এমন সমস্ত জমির উপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ কিংবা বিশভাগের একভাগ আদায় করতে হবে। গৃহপালিত পশুর বিশেষ একটা সংখ্যা বিশেষ সামঞ্জস্যের সাথে যাকাত হিসেবে আদায় করা হবে আর এ সমস্ত সম্পদ গরীব-ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহাযার্থে ব্যয় করা হবে। এটা এমন একটা সামাজিক বীমা-বিশেষ, যা বর্তমান থাকতে ইসলামী সমাজের কোন ব্যক্তিই জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন হতে বঞ্চিত হতে পারে না। কোন শ্রমজীবী ব্যক্তি উপবাস থাকার ভয়ে কারখানার মালিক কিংবা জমিদারের শোষণমূলক ও অসম্ভব শর্ত কবুল করতে কখনও বাধ্য হবে না। আর অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য যে শক্তি-সামর্থের আবশ্যক, কোন ব্যক্তিরই শক্তি তদপেক্ষা কম হতে পারবে না।

ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্য

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ইসলাম এমন সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চায় যাতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, অস্তিত্ব এবং তার আযাদী সঠিকভাবে বর্তমানা থাকতে পারে এবং সমাজের স্বার্থের জন্যও যেন তার আযাদী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং উপকারীই হয়। যে ধরনের রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যক্তিকে সমাজের মধ্যে একেবারে বিলীন করে দেয় এবং তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য আযাদীও অবশিষ্ট রাখে না। ইসলাম তা আদৌ সমর্থন করে না। কোন দেশের সকল উৎপাদান-উপায়কে জাতীয়করণের নিশ্চিত অর্থে দেশের সমগ্র ব্যক্তিকে সমাজ স্বার্থের কঠোর বন্ধনে নির্মমভাবে আবদ্ধ করে দেয়া ইসলামে মোটেই সমর্থনীয় নয়। এমতাবস্থায় ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র বহাল থাকা তার বিকাশ লাভ করা বড়ই কঠিন এবং অসম্ভব ব্যাপার। ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক আযাদী আবশ্যক তেমনি অর্থনৈতিক আযাদীও খুব বেশী পরিমাণে জরুরী। আমরা যদি মনুষ্যত্বের মূলোৎপাটন করতে না চাই, তবে সমাজ জীবনে লোকদের এতদূর সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই দিতে হবে যাতে আল্লাহর এক বান্দা তার নিজের রুযি-রোযাগার উপার্জন করে নিজের মনের স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারে এবং তার নিজের মানসিক ও নৈতিক শক্তি নিচয়কে নিজের রুচির ও ঝোক প্রবণতা অনুসারে বিকাশ করতে পারে। কন্ট্রেলের যে খাদ্যের মাপকাঠি থাকবে অন্য লোকদের হাতে তা যত প্রচুর হোক না কেন, সুখাদ্য ও সুখদায়ক কখনও হতে পারে না। কারণ তাতে মানব মনের সুষ্ঠু আযাদী ও ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মেদবহুল দেহের বিরাটত্ব তার কিছুমাত্র পূরণ করতে পারে না।

ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ

ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্নকারী কোন সমাজ ব্যবস্থা যেমন ইসলাম সমর্থন করে না, অনুরূপভাবে ইসলাম এমন কোন সমাজ ব্যবস্থাও পসন্দ করে না যা ব্যক্তিকে সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিরংকুশ আযাদী দান করে এবং তাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তিগত স্বার্থ রক্ষার খাতিরে সমাজকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার অবাধ সুযোগ দেয়। এ দু'সীমান্তের মাঝামাঝি যে পথ ইসলাম অবলম্বন করেছে, তা এই যে, প্রথমত সামাজিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিকে কয়েকটি দায়িত্ব পালন করতে ও নির্দিষ্ট সীমারেখা বহাল রাখতে বাধ করা হবে। এ সীমা ও দায়িত্বগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়। আমি এখানে শুধু তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব।

উপার্জনের সীমা

প্রথমে জীবিকা উপার্জনের কথাই ধরা হোক। অর্থোপার্জনের উপায় অবলম্বন করার ব্যাপারে ইসলাম যত সূক্ষ্ণ দৃষ্টির সাথে জায়েজ নাজায়েজের পার্থক্য করেছে, দুনিয়ার অন্য কোন আইন তা করেনি। যে সমস্ত উপায়ে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কিংবা সমষ্টিগতভাবে গোটা সমাজের নৈতিক অথবা বাস্তব ক্ষতিসাধন করে নিজের জীবিকা উপার্জন করতে পারে ইসলাম তা চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। শরাব ও মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করা তা বিক্রয় করা, বেশ্যাবৃত্তি, নৃত্য ও গান-বাজনার পেশা, জুয়া, দালালী, সুদ, ধোকা ও এমন ব্যবসায় যাতে এক পক্ষের লাভ নিশ্চিত এবং অপর পক্ষের লাভ অনিশ্চিত, প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ করে তার মূল্য বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ধরনের সামাজিক অনিষ্ট ও ক্ষতিকর কারবার ইসলামী আইনে চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতি যাচাই করে দেখলে হারাম পন্থাগুলোর একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি সামনে উপস্থিত হবে। তার মধ্যে এমন সব উপায়ে অর্থোপার্জন করার আযাদী দান করেছে যা দ্বারা সে মানুষের অন্য কোন প্রকৃত ও কল্যাণময় খেদমত করে ইনসাফের সাথে তার পারিশ্রমিক লাভ করতে পারে।

ব্যয় সংকোচ

হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব ইসলাম সমর্থন করে বটে, কিন্তু তা মোটেই সীমাহীন নয়। ইসলাম মানুষকে হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদকে ঠিক বৈধ পন্থায় ব্যয় করতে বাধ্য করে। ব্যয় সম্পর্কে ইসলাম এমন কতগুলো শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে, যার দরুন মানুষ সাদাসিদে ও পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ পূর্ণরূপে পেলেও বিলাসিতায় মোটেই অর্থ উড়াতে পারে না। কোনরূপ সীমাহীন শান-শওকত দেখাতে এবং একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে না। কয়েক প্রকারের বাজে খরচকে ইসলামী আইনে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রকারের বাজে খরচগুলোকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা না হলেও অন্যায়ভাবে টাকা খরচ করার কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখার ক্ষমতা ইসলামী হুকুমাতকে দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সমাজের অধিকার

জায়েজ উপায়ে অর্থোপার্জন ও জায়েজ পথে ব্যয় করার পর মানুষের নিকট যে অর্থ-সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তা সে সঞ্চয় করতে পারে এবং আরো বেশী উপার্জনের কাজে তা নিয়োগও করতে পারে। কিন্তু এ দু'টি অধিকারের উপর কয়েকটি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সঞ্চয় করলে 'নেসাব' পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা লাগাতে হলে শুধু হালার কারবারেই নিয়োগ করতে পারে। জায়েজ কারবার নিজেও করতে পারে, নিজের মূলধন-টাকা, জমি, যন্ত্র যাই হোক না কেন-অপরকে দিয়ে তার লাভ-লোকসানের অংশীদারও হতে পারে। এ উভয় পন্থাই সংগত। এ সীমার মধ্যে থেকে কোন মানুষ যদি কোটিপতি হয় তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তা আপত্তিকর কিছুই নয়, বরং তাকে আল্লাহর দানই মনে করে। কিন্তু সমাজ স্বার্থের জন্য তার উপর দু'টি শর্ত আরোপ করেছে। প্রথম, তার ব্যবসা পণ্যের যাকাত কিংবা কৃষিজাত দ্রব্যাদির এক-দশমাংশ আদায় করতে হবে। দ্বিতীয় এই যে, মানুষ তার ব্যবসায় কিংবা শিল্প অথবা কৃষিকার্যের ব্যাপারে যাদের সাথে শরীকদার হিসেবে কিংবা মজুরী দেয়া নেয়ার নিয়মে কাজ করবে, তাদের সাথে অবশ্যই ইনসাফ করতে হবে। এ ইনসাফ সে নিজে না করলে ইসলামী হুকুমাত তাকে এ জন্য বাধ্য করবে।

সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম

উল্লেখিত সংগত সীমার মধ্যে থেকে উপার্জন ও ব্যয় করার পর যে সম্পত্তি সঞ্চিত হবে, ইসলামে তাকেও খুব বেশী দিন পর্যন্ত সঞ্চিত অবস্থায় থাকতে দেয় না, বরং তার উত্তরাধিকার নিয়মের সাহায্যে বংশ পরম্পরায় তা বন্টন করে দেয়। এ ব্যাপারে ইসলামী আইনের লক্ষ্য দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র আইনের লক্ষ্য হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য আইন অর্জিত সম্পত্তি একেবারে পুরুষানুক্রমে চিরদিন সঞ্চিত করে রাখতে চায়। কিন্তু ইসলাম তার বিপরীত যে আইন রচনা করেছে, তাতে এক ব্যক্তির সঞ্চিত সম্পত্তি তার মৃত্যুর পরই তার নিকটাত্নীয়দের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। নিকটাত্নীয় কেউ না থাকলে দূর সম্পর্কীয় আত্নীয়গণই তাদের নির্দিষ্ট অংশ অনুপাতে অংশীদার হবে। আর দূরেরও কোন আত্নীয় না থাকলে সমগ্রভাবে সমস্ত মুসলিম সমাজই তার মালিক হবে। ইসলামের এ আইন কোন বড় পুজি কিংবা বিপুল জমির মালিকানাকেই স্থায়ী অথবা অক্ষত থাকতে দেয় না। এ সমস্ত বিধি-নিষেধের পরেও যদি কারো সম্পত্তি হয় এবং তা সমাজের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতির কারণ হয়, তবে এই শেষ আঘাতেই তাকে চূর্ণ করে দিতে যথেষ্ট।

* ইসলামী অর্থনীতি আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলো : ইমাম আবু ইউসুফ (র) স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল খারাজ'-এর 'তাউসী' হতে উদ্ধৃত করে এ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন :

"পতিত জমি (যার কোন মালিক নেই) আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূলের তারপর তো তোমাদেরই। কাজেই ঐ পতিত জমির আবাদ করবে তোমরাই। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় জমি অনাবাদী ও বেকারভাবে ফেলে রাখবে, তিন বছর পরে তাতে কোন অধিকার থাকবে না।" এ প্রসংগে ইমাম সাহেব হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইমাম জাহবীর হাদীস উল্লেখ করে বলেন : হযরত ফারুকে আযম (রা) স্বীয় খিলাফতকালে মিম্বারে দণ্ডায়মান হয়ে উপরের উদ্ধৃতিটি ঘোষণা করেন।

উপরে বর্ণিত হাদীসকে ভিত্তি করে আবু ইউসুফ (র) বলেন : "আমাদের (হানাফী মতাবলম্বীদের) নিকট ভূমি সংক্রান্ত অন্যতম বিধান এই যে, যে পতিত জমিতে পূর্ব হতে কারো মালিকানা স্বত্ব নেই, যদি কোন ব্যক্তি এটাকে কর্ষণযোগ্য ও আবাদ করে তবে তারই মালিকানা স্বত্ব বর্তাবে। অতএব যে তাকে নিজে কর্ষণ করতে পারে, অপরকে দিয়েও চাষাবাদ করিয়ে নিতে পারে অথবা স্বীয় অর্থ বিনিয়োগ করে আবাদ করে নিতে পারে। আর সে জমির উৎকর্ষতা সাধন হেতু পানি সেচ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যও করতে পারে।" [কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ (র)]

ইসলামের আধ্যাত্নবাদ

ইসলামের আত্নিক নীতি কি ? জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থার সংগেই বা তার সম্পর্ক কি ? এ বিষয়টি ভাল করে বুঝার জন্য আধ্যাত্নবাদ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারণার পারস্পরিক পার্থক্য সর্বপ্রথম বুঝে নিতে হবে। এ পার্থক্য ভাল করে না বুঝার দরুন ইসলামের আধ্যাত্নবাদ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে মানুষের মগযে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন সব ধারণা ঘুরপাক খেতে থাকে যা সাধারণত এ 'আধ্যাত্ন' শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এ সমস্যায় পড়ে মানুষ ইসলামের সঠিক আধ্যাত্নবাদকে খুব সহজে বুঝে উঠতে পারে না-যা 'আত্নার' জানা শুনা পরিসীমাকে অতিক্রম করে জড় এবং দেহের রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করে, শুধু আধিপত্য বিস্তারই নয় তার উপর প্রভুত্বও করতে চায়।

পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্ববাদের দ্বৈততা

দর্শন ও ধর্ম জগতে সাধারণ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী আত্না এবং দেহ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস, উভয়ের ক্ষেত্র ও পরিবেশ আলাদা, উভয়ের দাবী বিভিন্ন বরং পরস্পর বিরোধী এবং এই উভয় ক্ষেত্রেই একই সংগে উন্নতি লাভ কখনো সম্ভব নয়। দেহ এবং বস্তুজগত 'আত্নার' কারাগার বিশেষ, পার্থিব জীবনের সম্পর্ক-সম্বন্ধ এবং মনের ইচ্ছা-বাসনার হাতকড়ীতে আত্না বন্দী হয়ে পড়ে। দুনিয়ার কাজ-কারবার ও লেন-দেনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ হয়ে 'আত্নার উন্নতি' শেষ হয়ে যায়। এ ধারণার অবশ্যাম্ভাবী ফলে আধ্যাত্নবাদ এবং পার্থিব জীবনের পথ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। যারা পার্থিব

জীবন অবলম্বন করল, তারা প্রথম পদক্ষেপেই নিরাশ হয়ে পড়ল এবং মনে করতে লাগল যে, এখানে আধ্যাত্মবাদ তাদের সংগে কোনক্রমেই চলতে পারবে না। হতাশাই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত জড়বাদের পংকিল আবর্তে নিমজ্জিত করেছে। সমাজ, তামাদ্দুন, রাজনীতি, অর্থনীতি-মানুষের জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগ আধ্যাত্মবাদের নির্মল আলোক জ্যোতি হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে গেল। আর সর্বশেষে বিশাল পৃথিবী যুলুল-নিপীড়নের সয়লাব শ্রোতের রসাতলে চলে গেল। অন্যদিকে যারা আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করল, তারা নিজ নিজ 'আত্মার' উন্নতির জন্য এমন সব পথ খুজে বের করল, এ দুনিয়ার সঙ্গে যার কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন কোন পথ নেই, যা দুনিয়ার মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। তাদের মতে আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য দেহের নিপীড়ন বা নির্যাতন অত্যন্ত জরুরী। এ কারণেই তারা এমন সব অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধনের নিয়ম উদ্ভাবন করল, যা 'নফসকে' নিসন্দেহে ধ্বংস করে দেয় এবং দেহকে করে দেয় অবশ্য ও পংগু। আধ্যাত্মিক দীক্ষার জন্য নিবিড় অরণ্য, পর্বত গুহা এবং এ ধরনের নির্জন কুটির প্রাঙ্গণকেই উপযুক্ত স্থান বলে মনে করল, যেন সমাজের কর্ম-কোলাহল তাদের এ ধ্যান-তপস্যার গভীর একাগ্রতায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘ্যাত সৃষ্টি করতে না পারে। আত্মার ক্রমবিকাশ সাধনের জন্য তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার এ বিপুল কর্মমুখরতা হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং পার্থিব জগতের সংস্পর্শে আসার সম্পস্ত সম্পর্ক ও সম্বন্ধকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে ফেলল। আত্মার উন্নতির জন্য এটা ভিন্ন অন্য কোন পথই তারা সম্ভব বলে মনে করল না।

পূর্ণতার দু'টি মত

দেহ ও আত্মার এ দ্বৈততা এবং ভিন্নতা মানুষের পূর্ণতা লাভের দু'টি ভিন্ন মত ও লক্ষ্য সৃষ্টি করেছে। একদিকে হচ্ছে পার্থিব জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা-অর্থাৎ শুধু জড় ও বাস্তব সম্পদে পরিপূর্ণ হওয়া। মানুষ যখন একটা উত্তম পাখী, একটা উৎকৃষ্ট কুমীর, একটা ভাল ঘোড়া এবং একটা সার্থক শৃগাল হতে পারেব, তখনই সে পূর্ণতার একেবারে চরমতম স্তরে উন্নীত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অন্যদিকে হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা। মানুষ কিছু অতি মানবিক ও অস্বাভাবিক শক্তির মালিক হলেই তা লাভ হলো বলে মনে করা হয়। আর মানুষের একটা ভাল রেডিও সেট, একটা শক্তিমান দূরবীণ এবং একটা সূক্ষ্মদর্শী যন্ত্রে পরিণত হওয়া কিংবা তার দৃষ্টি এবং তার কণ্ঠ নি:সৃত শব্দের একটা পরিপুর্ণ ঔষধালয়ের কাজ দিতে শুরু করাই হয়েছে এ পথে পূর্ণতা লাভের একেবারে সর্বশেষ স্তর।

মানব সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

এ ব্যাপারে ইসলামের আদর্শ দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র ধর্মীয় ও দার্শনিক নীতি হতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইসলাম বলে যে, আল্লাহ তায়ালা মানবাত্মাকে এ পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। কিছু ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা, কিছু কর্তব্য, কিছু দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেছেন এবং এসব পালন করার জন্য সর্বোত্তম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দেহও তাকে দান করেছেন। এ দেহ তাকে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, তার স্বাধীনতার প্রয়োগ এবং তার সমস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য তার দেহকে ব্যবহার করবে। অতএব এ দেহ তার আত্মার কারবার নয়, এটা তার কারখানা। এ আত্মার কোন উন্নতি যদি সম্ভবই নয়, যোগ্যতার বাস্তব পরিচয় দেয়ার ভিতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া এ দুনিয়া কোন শক্তির ক্ষেত্রও নয়-মাবাত্মা এখানে কোন রকমে বন্দী হয়ে পড়েছে এরূপ মনে করা যেতে পারে না। বরং এটি একটি কর্মক্ষেত্র, কাজ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানকার অসংখ্য জিনিস তার অধীন করে দেয়া হয়েছে। এখানে আরো অনেক মানুষকে এ খিলাফতের বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য তার সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে প্রকৃতির সাধারণ দাবী অনুযায়ী তামাদ্দুন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং জীবনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাকে তারই জন্য তৈরী করা হয়েছে। এখানে কোন আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি সম্ভব হয় তবে তা দুনিয়ার এ বিপুল কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত যোগ্যতার পরিচয় দিলেই তা সম্ভব। এটা তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। জীবনের প্রত্যেকটা দিক ও প্রত্যেকটা বিভাগ সেই পরীক্ষার একেকটা 'প্রশ্নপত্র' বিশেষ। ঘর, মহল্লা, হাট-বাজার, অফিস, কারখানা, শিক্ষাগার, থানা, আদালত, সৈন্য শিবির, পার্লামেন্ট, সন্ধি সম্মেলন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র-সবকিছুই ভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র। এটা পূর্ণরূপে লিখে দেবার জন্যই তাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি এদের মধ্যে কোন বিষয়ে পূর্ণ সময় তার এবং তার উত্তর না দেয় কিংবা অধিকাংশ প্রশ্নপত্রের কোন উত্তরই যদি সে না লিখে তবে তার ফলে শূণ্য ছাড়া সে আর কি-ইবা পেতে পারে ? সে যদি তার সমস্ত লক্ষ্যকেই এ পরীক্ষা দেয়ার কাজে নিযুক্ত করে আর যত প্রশ্নপত্রই তাকে দেয়া হয়েছে, তার প্রত্যেকটার সে কিছু না কিছু উত্তর লিখে দেয়, তবেই যে সফলতা এবং উন্নতি লাভ করতে পারে, অন্যথায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বৈরাগ্যবাদের প্রতিবাদ

ইসলাম এভাবে জীবনের বৈরাগ্যবাদী ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দুনিয়ায় বাহির হতে নয়, এর মধ্য হতেই বের করেছে। আত্মার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ এবং সাফল্য সার্থকতা লাভ করার আসল উপায় ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন সমুদ্রের মাঝখানেই অবস্থিত-তার কিনারে নয়। ইসলাম আমাদের আত্মার উন্নতি ও অবনতির মাপকাঠি কি উপস্থিত করে তাই বিচার্য। বস্তুত এ প্রশ্নের জবাব খিলাফতের পূর্ব বর্ণিত ধারণার মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। 'খলিফা' হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার সামনে মানুষ তার পরিপূর্ণ জীবনের কার্যাবলীর জবাবদিহি করতে বাধ্য। পৃথিবীতে যে স্বাধীনতা ও বিবিধ উপায়-উপাদান তাকে দান করা হয়েছে, সে সবগুলোকে আল্লাহর মর্জি অনুসারে ব্যবহার করাই তার কর্তব্য। যে শক্তি ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, তা সে আল্লাহ তায়ালার অধিক হতে অধিকতর সন্তোষ লাভের জন্য ব্যয় করবে। অন্য মানুষের সঙ্গে তাকে যেসব সম্পর্ক সম্বন্ধ দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে, তাতে সে আল্লাহর মনোনীত নীতি অবলম্বন করবে। মোটকথা নিজে সমগ্র চেষ্টা-সাধনা ও শ্রম-মেহনত ব্যয় করে পৃথিবী এবং তার মধ্যস্থিত মানুষের জীবনকে এত সুন্দর ও সুশৃংখল করবে, যত সুন্দর ও শৃংখলাপূর্ণ অবস্থায় তাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান। মানুষ যত বেশী দায়িত্ব জ্ঞানের অনুভূতি, কর্তব্যপরায়ণতা, আনুগত্য এবং মালিকের সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহ সহকারে এ কর্তব্য পালন করবে, আল্লাহ তায়ালার ততখানি নৈকট্য সে লাভ করতে পারবে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভই হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি। ঠিক এর বিপরীত সে যতখানি অলস, কর্মবিমুখ কর্তব্যজ্ঞানহীন হবে, অথবা দুর্বিনীতি, বিদ্রোহী এবং অবাধ্য হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে সে ততখানি বঞ্চিত হবে। আর আল্লাহর নিকট হতে দূরে পড়ে থাকলেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় আধ্যাত্মিক অধপতন।

পার্থিব জীবনেই আত্মার উন্নতি

উপরের ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী ধার্মিক ও দুনিয়াদার-উভয় ব্যক্তিরই কর্মক্ষেত্র এক, এরা উভয়ে একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করবে। এবং সত্য বলতে গেলে দ্বীনদার ব্যক্তি দুনিয়াদার অপেক্ষাও অনেক বেশী কর্মব্যস্ত থাকবে। ঘরের চার প্রাচীর হতে শুরু করে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স পর্যন্ত জীবনের যত ক্ষেত্র এবং ব্যাপারই হোক না কেন, এর যাবতীয় দায়িত্ব দ্বীনদার ব্যক্তি দুনিয়াদার ব্যক্তির শুধু সমান নয় বরং বেশী পরিমাণে নিজের উপর চাপিয়ে নিবে। তবে এ জিনিস এ উভয় ব্যক্তির পথকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের স্বরূপ। দ্বীনদার ব্যক্তি যাই করবে তা ঠিক এ অনুভূতি নিয়েই করবে যে, আল্লাহর নিকট হতেই তার উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যই সে কাজ করবে এবং আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত আইন অনুসারেই তা করবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার ব্যক্তি সমস্ত কাজই করবে দায়িত্বহীনভাবে এবং নিজের ইচ্ছামত। এ পার্থ্যকই দ্বীনদার ব্যক্তির সমগ্র পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জীবনে পরিণত করে এবং দুনিয়াদার ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে আধ্যাত্মিকতার আলো হতে বঞ্চিত করে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির চার স্তর

ইসলাম পার্থিব জীবনের মাঝ দরিয়ায় মানুষের বৈষয়িক উন্নতির যে পথ তৈরী করেছে এখন সংক্ষেপে তার আলোচনা করব। এ পথের প্রথম স্তর হচ্ছে 'ঈমান'। অর্থাৎ মানুষের মন ও মগযে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হওয়া যে, আল্লাহ-ই তার মালিক, আইন রচয়িতা এবং উপাস্য। আল্লাহর সন্তোষ লাভই তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর আইন-ই তার জীবনের একমাত্র আইন। এ বিশ্বাস যতদূর গভীর এবং দৃঢ় হবে, মানুষের মন ততই পরিপূর্ণ ইসলামী হবে। আর ততবেশী দৃঢ়তার সাথে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চলতে পারবে।

এ পথের দ্বিতীয় মনযিল হচ্ছে 'এতায়াত'-আনুগত্য, অর্থাৎ কার্যত মানুষের নিজের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করা এবং কর্মজীবনে সেই আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল করা যাকে সে নিজের রব বলে মেনে নিয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় এ এতায়াতের নাম হচ্ছে- 'ইসলাম'।

তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে ‘তাকওয়া’। সহজ ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ। মানুষ নিজের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই একথা স্মরণ রেখে কাজ করবে যে, আল্লাহর সমীপে তার চিন্তা, কথা ও কাজের পরিপূর্ণ হিসেব দিতে হবে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রত্যেক কাজ হতে সে বিরত থাকবে। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি খেদমতের জন্য কোমর বেধে লেগে যাবে এবং পরিপূর্ণ সাবধানতার সাথে হালাল-হারাম, সত্য-মিথ্যা এবং ভাল-মন্দের বিচার করে পথ চলবে-বস্তুত এটাই হচ্ছে ‘তাকওয়া’।

শেষ ও সর্বোচ্চ স্তর

সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ মনযিল হচ্ছে ‘ইহসান’। ইহসানের অর্থ আল্লহর মর্জির সাথে মানুষের মর্জির একাত্নতা। আল্লাহ যা পসন্দ করেন, মানষও ঠিক তা-ই পসন্দ করবে। আর আল্লাহ যা পসন্দ করেন না, মানুষের মনও ঠিক তাকে অপসন্দ করবে। আল্লাহ তার নিজের পৃথিবীতে যেসব পাপের অস্তিত্ব দেখতে ভালবাসেন না, মানুষ নিজেও তা হতে দূরে সরে থাকবে। বরং তাকে বিলুপ্ত করার জন্য মানুষ সমগ্র শক্তি এবং সকল প্রকার উপায়কে নিয়োজিত করবে। আর আল্লাহ তার দুনিয়াকে যেসব কল্যাণ ব্যবস্থায় সুসজ্জিত দেখতে চাহেন মানুষ শুধু তার নিজেকে তা দ্বারা সজ্জিত করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং মরণপন সংগ্রাম করে সারা দুনিয়াতে তাকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করবে। এ স্তরে পৌছলেই মানুষের ভাগ্যে আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ ঘটে। এ জন্যই এটা মানুষের আধ্যাত্নিক উন্নতির সর্বোচ্চ অধ্যায়।

জাতি ও রাষ্ট্রীয় তাকওয়া এবং ইহসান

আধ্যাত্নিক উন্নতির এ পথ আলাদাভাবে কেবল ব্যক্তিদের চলার জন্যই নয়, সমগ্র সমাজ ও জাতির জন্য এটাই একমাত্র পথ। স্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় একটি জাতিও ঈমান, এতায়াত এবং তাকওয়ার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে ইহ্সানের সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারে। একটা রাষ্ট্রও এর সমগ্র ব্যবস্থা সহকারে ‘মু’মিন’, ‘মুসলিম’, ‘মুত্তাকী’ এবং ‘মুহসীন’ হতে পারে। বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের উদ্দেশ্য ঠিক তখনি পূর্ণতা লাভ করতে পারে, যখন একটা জাতিই এ পথে চলতে শুরু করে এবং দুনিয়ার বুকে মুত্তাকী ও মুহসিন-তাকওয়াপূর্ণ ও ইহ্সানওয়ালা-রাষ্ট্র কায়েম হবে।

আধ্যাত্নিকতার জন্য ইসলামের দীক্ষা পদ্ধতি

ব্যক্তি ও সমাজের আধ্যাত্নিক দীক্ষা পালনের জন্য এবং এটাকে উচ্চতম আদর্শের উপযোগী করে তৈয়ার করার জন্য ইসলাম যে পন্থা অবলম্বন করেছে সর্বশেষে তার বিশ্লেষণ করব। ইসলামের এ দীক্ষা পদ্ধতির বুনিয়াদী পন্থা চারটি।

প্রথম পন্থা হচ্ছে-সালাত। ইহা দৈনিক পাচবার মানুষকে নতুন করে আল্লহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহর ভয়কে বারবার সতেজ করে দেয়। এতে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা মানুষের নিত্য নতুন করে জেগে উঠে। তার আদর্শ ও বিধি-নিষেধ পুন: পুন: মানুষের সামনে উপস্থিত করে। এবং তা অনুসরণ করে চলার কথা বারবার স্মৃতিপটে জাগ্রত করে। সালাত শুধু একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারই নয়, তা জামায়াতের সাথেই আদায় করার জন্য ফরয করা হয়েছে, যেন গোটা সমাজেই সমষ্টিগতভাবেই এ আধ্যাত্নিক উন্নতির পথে চলার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে-সওম। এটা প্রত্যেক বছরই পূর্ণ এক মাসকাল ধরে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তিকে এবং সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম সমাজকে তাকওয়ার দীক্ষা দেয়।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে-যাকাত। এটা মুসলিম ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থ দান, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। আজকালকার মানুষ ভুলবশত যাকাতকে ট্যাক্স বলে মনে করছে। অথচ যাকাতের মূল ভাবধারা ট্যাক্সের ভাবধারা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাকাতের আসল অর্থ হচ্ছে ক্রমবিকাশ ও পবিত্রতা দান। এ শব্দটি দ্বারা ইসলাম মানুষের মনে এই নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতি জাগিয়ে দিতে চায় যে, আল্লাহর প্রেমে তুমি তোমার ভাইদেরকে যে আর্থিক সাহায্য করবে, তাতে তোমার আত্মা উন্নতি লাভ করবে এবং তোমার চরিত্র পূত ও পবিত্র হবে।

চতুর্থ পন্থা হচ্ছে-হজ্জ। এটা আল্লাহর ইবাদাতের কেন্দ্রস্থল। ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে একত্র করে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে। এবং এটা এমন আন্তর্জাতিক আন্দোলন পরিচালিত করে, যা দুনিয়ার কয়েক শতাব্দী কাল ধরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইনশআল্লাহ ভবিষ্যতেও অনন্তকাল পর্যন্ত তা সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে।